মাছ ব্যাঙ সাপ

রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়

প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস (পাব্লিকেশন্স) লিঃ
২২।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

[মূল্য ১৮০ এক টাকা বার আনা

প্রকাশক :—

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক,

ইণ্ডিয়ান প্রেস (পাব্লিকেশন্স্) লিঃ,

কলিকাতা।

মুদ্রক :—

অমলকুমার বসু,

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিঃ,

বেনারস শাখা।

নিবেদন

বইখানির নাম "মাছ ব্যাঙ্ সাপ" হইলেও ইহাতে কুমীর, কচ্ছপ, টিক্‌টিকি ও গিরগিটি প্রভৃতি আরো অনেক প্রাণীর বৃত্তান্ত আছে। বালক-বালিকারা যাহাতে এই-সব প্রাণীর পরিচয় গ্রহণ করিতে পারে, তাহার জন্য সরল ভাষায় পুস্তকখানি লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহারা পুস্তক পাঠে আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে শ্রীমান্ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব-শর্ম্মা এই পুস্তকের কয়েকখানি ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন। এই সুযোগে তাঁহাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শান্তিনিকেতন,
আশ্বিন
১৩৩০

শ্রীজগদানন্দ রায়

সূচীপত্র

মাছ ব্যাঙ্ সাপ

প্রথম কথা

জীব ও জড়

আমরা প্রতিদিন চারিদিকে ইট্-কাঠ, ছাগল-গরু, বিছে-ব্যাঙ্, মাটি-পাথর গাছ-পালা ইত্যাদি যে কত জিনিষ দেখি তাহা গুণিয়াই শেষ করা যায় না। এই সব জিনিষের মধ্যে সবগুলিই কি জ্যান্ত? তোমরা যদি একটু ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিবে সব জিনিসই জ্যান্ত নয়। জ্যান্ত জিনিস কাহাকে বলে তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। যাহা একটু চলা-ফেরা বা নড়া-চড়া করে, আমরা মনে করি তাহাই বুঝি জ্যান্ত। কিন্তু তাহা ঠিক্ নয়। এক বাটি জলের উপরে একটু কর্পূর ফেলিয়া পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে কর্পূরের কণাগুলি জলের উপরে ভাসিয়া ঠিক জলের পোকার মতো কিল্-বিল্ করিয়া বেড়াইতেছে। তোমরা কর্পূরকে কি জ্যান্ত জিনিস বলিবে? কর্পূর জ্যান্ত জিনিস নয়।

গাছ-পালা এবং জন্তু-জানোয়ারেরাই জ্যান্ত জিনিস। ইহাদিগকে জীব নাম দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া মাটি-পাথর, সোনা-লোহা, ইট্-কাঠ ইত্যাদি জিনিস জ্যান্ত নয়। ইহাদের নাম দেওয়া হয় জড়। ইহারা মরা।

জীব অর্থাৎ জ্যান্ত জিনিসের কতকগুলি লক্ষণ আছে। এই সব লক্ষণ দেখিয়া কোন্ জিনিসকে তোমরা জীব বলিবে এবং কোন্ জিনিসকেই বা জড় বলিবে, তাহা সহজে ঠিক্ করিতে পারিবে।

জীবমাত্রেরই এক-একটা নির্দ্দিষ্ট আকার আছে। ইঁদুর কত ছোটো জীব তোমরা তাহা দেখিয়াছ। খুব ভাল করিয়া খাবার দিলে, সে কখন্ই হাতীর মতো বড় হয় না। বাচ্চা ইঁদুর একটু একটু করিয়া বড় হয় বটে, কিন্তু কখনই তাহাকে ধাড়ী ইঁদুরদের চেয়ে বড় হইতে দেখা যায় না। আমরা কেবল ইঁদুরদের কথা বলিলাম। তোমরা একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিবে কাক-বক, শেয়াল-কুকুর, মানুষ-ভেড়া আমগাছ, কাঁঠালগাছ প্রভৃতি কোন জীবই, তাহাদের বংশের যে এক-একটা আকৃতি ধরা আছে তাহা ছাড়াইয়া যায় না। মানুষকে তোমরা কখনো তাল গাছের মতো উঁচু হইতে দেখিয়াছ কি? সে হাতীর মতো মোটাও হয় না। কিন্তু যে-সব জিনিস জ্যান্ত নয়, তাহাদের আকৃতির সীমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পাথর জ্যান্ত জিনিস নয়, তাই ইহার আকৃতির সীমা পাওয়া যায় না। ছোটো ঢিলের মতো পাথরও আছে,

আবার হিমালয় পর্ব্বতের মতো বড় বড় পাথরও দেখা যায়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এক-একটা নির্দ্দিষ্ট আকৃতি জীবের প্রথম লক্ষণ।

জীবের দ্বিতীয় লক্ষণ হইতেছে, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট অবয়ব অর্থাৎ চেহারা। মানুষ, গরু, হাতী, ঘোড়া, চামচিকা, বিছা প্রভৃতি প্রত্যেকেরই এক-একটা নির্দ্দিষ্ট চেহারা নাই কি? মানুষের দুইখানি হাত, দুইখানি পা, দুইটি চোখ, একটা নাক আছে। ইহার অন্যথা কোনো মানুষেই দেখা যায় না। বাদুড়ের মতো ডানাওয়ালা, হাতীর মতো শুঁড়ওয়ালা এবং প্রজাপতির মতো ছয়খানা পা-ওয়ালা মানুষ তোমরা সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়াও বাহির করিতে পারিবে না। আবার, বিড়ালের মতো থাবাওয়ালা, গরুর মতো শিঙ্‌ওয়ালা হাতীও খুঁজিয়া মিলিবে না। সুতরাং দেখ, আমরা যাহাদিগকে জ্যান্ত অর্থাৎ জীব বলি, তাহাদের প্রত্যেকেরই এক-একটা ধরা-বাঁধা চেহারা আছে। কিন্তু ইট, পাথর, কাঠ, জল ইত্যাদি জড় জিনিসের সে-রকম বাঁধা চেহারা নাই।

যাহারা জ্যান্ত, তাহাদের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য খাবারের দরকার হয়। এই খাবার শরীরের ভিতরে লইয়া তাহারা শরীরকে পুষ্ট করে। একবেলা না খাইলে কি রকম কষ্ট হয়, তাহা তোমরা দেখ নাই কি? ছাগল, গরু, ভেড়া, গাছ-পালা সকলেরি সেই রকম খাবারের দরকার হয়। খাবার না পাইলে তাহারা কষ্ট পায় এবং বড় হইতে পারে না,—শেষে দুর্ব্বল

হইয়া মারা যায়। কিন্তু যে-সব জিনিস জড় তাহাদের খাবারের দরকার হয় না এবং তাহারা জীবদের মতো বাড়েও না। তোমাদের পড়িবার ঘরে যে টেবিলখানি রহিয়াছে, তাহাকে তোমরা কি রোজ খাবার খাইতে দাও? তোমাদের পোষা বাচ্চা কুকুরটি খাবার চায়, কিন্তু টেবিলখানি খাবার চায় না। তাই কুকুরটি যেমন দিনেদিনে বড় হয়, টেবিল সে-রকম বড় হয় না। এই জন্যই কুকুরকে আমরা জীব বলি এবং টেবিলখানিকে বলি জড়।

সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন করা জীবের আর একটা লক্ষণ। তোমাদের বাড়ীর আঙিনায় যে চারিখানি ইট্ পড়িয়া আছে, তাহা দুই মাস পরে, আপনা হইতেই আটখানা হইয়া দাঁড়াইল, ইহা তোমরা দেখিয়াছ কি? এ-রকম ঘটনা কখনই ঘটে না। কিন্তু তোমরা যদি এক জোড়া সাদা ইঁদুর বা গিনিপিগ্ পুষিয়া পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, এক জোড়া ইঁদুর বা গিনি-পিগ্ কয়েক মাসের মধ্যে অনেক বাচ্চা প্রসব করিয়া দশ-বারোটা হইয়া দাঁড়াইবে। তাহা হইলে দেখ,—সন্তান উৎপন্ন করা জীবের আর একটা প্রধান লক্ষণ।

এখন বোধ হয় তোমরা বুঝিয়াছ, আমরা প্রতিদিন যেসব জিনিস দেখিতে পাই; তাহাদের মধ্যে এক দল জীব এবং আর এক দল জড় আছে।

প্রাণী ও উদ্ভিদ্

তোমরা হয় ত মনে করিতেছ, আমগাছ, পেয়ারাগাছ ও তোমাদের বাগানের ফুলগাছগুলি জ্যান্ত নয়। কিন্তু তাহা নয়, ইহারা তোমাদের পোষা বিড়ালটীর মতোই জ্যান্ত। বিড়ালের মুখের কাছে এক বাটি দুধ রাখিলে সে চুক্-চুক্ করিয়া দুধটুকু খাইয়া ফেলে। তোমাদের বাগানের চারা আম গাছটির কাছে একথালা ভাত বা একপেয়ালা দুধ রাখিলে সে তাহা সে-রকমে খায় না বটে, কিন্তু বাঁচিবার জন্য তাহারও খাবারের দরকার হয়। গাছ-পালারা শিকড় দিয়া মাটি হইতে এবং পাতা দিয়া বাতাস হইতে মনের মতো খাবার চুষিয়া খায়। তাই তাহারা দিনে-দিনে বাড়ে। তার পরে ছাগল, গরু, ভেড়া প্রভৃতির যে-রকম বাচ্চা হয়, ইহাদেরো সেই রকম ছোটো ছোটো চারা হয়।

তাহা হইলে দেখ, জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গে গাছ-পালাদের এসব বিষয়ে তফাৎ নাই। কিন্তু অন্য বিষয়ে তফাৎ আছে অনেক। জন্তু-জানোয়ারদের যেমন চোখ, কান ইত্যাদি রকম-রকম ইন্দ্রিয় আছে, গাছ-পালাদের সে-সব কিছুই নাই। তা' ছাড়া শরীরের ভিতরকার যে-সব যন্ত্র দিয়া জন্তুদের জীবনের কাজ চলে, ইহাদের শরীরের ভিতরে ঠিক্ সে-রকম যন্ত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। গাছ-পালা ও জন্তু-জানোয়ারকে

একই রকমের জীব বলা যায় না। এই কারণেই পণ্ডিতেরা জন্তু-জানোয়ারকে প্রাণী নাম দিয়াছেন এবং গাছ-পালাদের বলিয়াছেন উদ্ভিদ্।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, জীবদের মধ্যেও দুইটি দল আছে। এক দলের নাম প্রাণী এবং আর এক দলের নাম উদ্ভিদ্।

যাহা হউক, আমরা এই বইয়ে উদ্ভিদ্ অর্থাৎ গাছ-পালাদের কোনো কথা বলিব না,—কেবল কতকগুলি প্রাণীরই খবর একে-একে তোমাদিগকে দিব। আমরা প্রাণীদের কোনো খবর রাখি না। কিন্তু নানা দেশের পণ্ডিতেরা বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া প্রায় সব প্রাণীরই খবর যোগাড় করিয়াছেন। তাহারা কোথায় কি-রকমে জন্মে, কি খায়, কি-রকমে তাহাদের বাচ্চা হয় এবং তাহাদের শরীরগুলিই বা কি-রকম, এই সব খবর তাঁহারা জানিয়াছেন। আমরা তোমাদিগকে একে-একে সেই সব কথাই বলিব।

আমরা প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিয়াই দেখি, ঘরের বারান্দায় চড়াইপাখীগুলা কিচ্‌মিচ্ করিতেছে; দুইটা কাক প্রাচীরের উপরে বসিয়া কা-কা করিয়া ডাকিতেছে; আঙিনায় জবাগাছের সবুজ পাতার আড়ালে একটা দুর্গা-টুন্‌-টুনি লুকাইয়া কিসের সন্ধান করিতেছে; আতাগাছের ডালে দু'টা কাঠবিড়াল লেজ ফুলাইয়া লাফালাফি করিতেছে। আমরা প্রতিদিনই এই রকম নানা প্রাণীদের আনন্দে বেড়াইতে

দেখি,—এরা যেন আমাদের পরম বন্ধু। ইহারা কোথায় থাকে, কি-রকমে জন্মে, কি-রকমেই বা বড় হয়, এই সব কথা তোমাদের জানিতে ইচ্ছা করে না কি ?

ছেলেবেলায় দেখিয়াছি, আমাদের বাড়ীতে কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রতিদিনই খুব ভোরে নাকে নথ-পরা একটি কাক আসিত। বোধ হয়, মজা দেখিবার জন্য কেহ কাকটিকে ধরিয়া নাকে নথ পরাইয়া দিয়াছিল। কাকটি সমস্ত দিনই আমাদের বাড়ীতে চরিয়া বেড়াইত। তার পরে সন্ধ্যার সময়ে কোথায় উড়িয়া যাইত। তখন বড়ই ইচ্ছা হইত, কাকটিকে জিজ্ঞাসা করি,—"তুই রাত্রিতে কোথায় যাস্ ; তোর বাপ-মা কোথায় ? তোর কি ছেলেপিলে নাই ?" তোমাদের বাড়ীর আঙিনাতে যখন শালিক পাখীরা জড় হইয়া কিচির-মিচির শব্দ করিতে থাকে, তখন বোধ করি তোমাদেরও ইচ্ছা হয়, উহারা ঘর-কন্নার কি কথা বলিতেছে শুনিয়া লই।

যাহা হউক, তোমরা প্রতিদিনই মাছ, ব্যাঙ্, সাপ, টিক-টিকি, প্রভৃতি যে-সব প্রাণী দেখিতে পাও, তাহাদের কতক-গুলির জীবনের কথা তোমাদিগকে বলিব। এ-সব জানিয়া রাখা ভালো।

প্রাণীদের শ্রেণী বিভাগ

তোমরা বোধ হয় মনে কর, পৃথিবীতে বুঝি মানুষই বেশী আছে। কিন্তু তাহা নয়। ফড়িং, প্রজাপতি, পিঁপ্ড়ে, মাছ,

ব্যাঙ্, পাখী ইত্যাদি অনেক প্রাণীই সংখ্যায় মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। গুগ্লি ও শামুক তোমরা খালে ও পুষ্করিণীতে অনেক দেখিয়াছ। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহাদের ষাট্ হাজার উপজাতি আছে। আবার এক এক উপজাতিতে কোটি কোটি শামুক বা গুগ্লি আছে। তাহা হইলে দেখ, শামুক-গুগ্লিই পৃথিবীতে কত রহিয়াছে। পৃথিবীতে মোট দেড় শত কোটি মানুষ আছে। উহাদের সংখ্যা মানুষের সংখ্যার চেয়ে বেশি নয় কি? ফড়িং, প্রজাপতি, মাকড়সা, কেন্নো বিছা, এঁটুলি প্রভৃতি পোকা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ইহাদের চারি লক্ষ্য উপজাতি আছে এবং প্রত্যেক উপজাতিতে কোটি কোটি প্রাণী রহিয়াছে। ভাবিয়া দেখ, পৃথিবীতে এই সব ছোটো প্রাণী কত বেশি আছে। আমাদের জল, স্থল ও আকাশ যেন প্রাণীতে প্রাণীতে পরিপূর্ণ। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তাহাদের তুলনায় কিছুই নয়। এক-একটা পিঁপ্ড়ের গাদায় কত পিঁপ্ড়ে থাকে একবার ভাবিয়া দেখ। এক-একটা বড় সহরে তাহাদের চেয়ে অনেক কম মানুষ বাস করে।

তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছ, যাঁহারা প্রাণীর বিষয় আলোচনা করেন, তাঁহারা এত প্রাণীর হিসাব রাখিতে খুব কষ্ট বোধ করেন। কিন্তু তাহা নয়, তাঁহারা যে-রকমে হিসাব রাখেন, তাহা অতি সুন্দর ও সহজ। তোমাদিগকে এখানে সেই কথাটাই বলিব।

লড়াইয়ের সময়ে দুই তিন লক্ষ সৈন্য একত্র জমা হয়। যিনি সেনাপতি তিনি এই সব সৈন্যের হিসাব রাখেন না কি? তিনি খুব ভালো করিয়াই হিসাব রাখেন। হিসাব রাখা হয় বলিয়াই কেহ যুদ্ধে মারা গেলে, তাহা জানা যায়; কেহ পালাইয়া গেলে, তৎক্ষণাৎ তাহার খোঁজ আরম্ভ হয়। সেনাপতিরা দুই তিন লক্ষ সৈন্যের হিসাব কি-রকমে রাখেন তোমরা বোধ হয় তাহা জানো না। তাঁহারা সমস্ত সৈন্যকে দশ-বারোটি বড় বড় দলে ভাগ করেন এবং প্রত্যেক দলের সৈন্যদের এক এক রঙের পোষাক পরিতে দেন। কাজেই, সৈন্যদের নাম জানা না থাকিলেও তাহারা কোন্ দলের তাহা পোষাকের রঙ্ দেখিয়া ধরা পড়ে। কিন্তু ইহাতেও এই সব বড় দলের হিসাব রাখা সহজ হয় না। তাই সেনাপতিরা ঐ বড় দলের প্রত্যেকটিকে আবার ছোটো ছোটো অনেক দলে ভাগ করিয়া ফেলেন এবং সেই সব ছোটো দলের প্রত্যেকের পোষাকে বা টুপিতে এক-একটা বিশেষ চিহ্ন লাগাইয়া দেন। এই রকম ছোটো দলে তিন বা চারি শতের বেশি সৈন্য থাকে না। কাজেই, এই রকমে সমস্ত সৈন্যের একটা হিসাব থাকিয়া যায়।

যে-সব পণ্ডিত প্রাণীদের বিষয় আলোচনা করেন, তাঁহারা কতকটা সেনাপতিদের মতোই জীব-জন্তুর হিসাব রাখেন। পাখীর শরীরের গঠন যে-রকম, ইঁদুরের সে-রকম নয়; ভেড়ার গঠন প্রজাপতির গঠন সে-রকম নয়। প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা

জন্তু-জানোয়ারের শরীরের এই রকম গঠন দেখিয়াই তাহাদিগকে নানা দলে ভাগ করিয়া থাকেন।

তোমরা প্রতিদিনই অনেক পোকামাকড় ও জন্তু-জানোয়ার চারিদিকে দেখিতে পাও। যদি একটু ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে জানিতে পারিবে, শরীরের গঠনের একটা বড় তফাৎ আছে। কেঁচো, জোঁক, কৃমি, কেন্নো, ফড়িং, মাছি, বিছে, শামুক প্রভৃতি প্রাণীদের শরীরে হাড় নাই। কিন্তু মানুষ, বানর, ছাগল, সাপ, ব্যাঙ্, মাছ প্রভৃতি জন্তুদের শরীরে হাড় আছে এবং শরীরের মাঝ দিয়া মাথা পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই এক-একটা মেরু-দণ্ড অর্থাৎ শিরদাঁড়া আছে। মেরুদণ্ড একখানি হাড় দিয়া তৈয়ারি নয়,—অনেক-গুলি ছোটো ছোটো হাড় গায়ে গায়ে থাকিয়া মেরুদণ্ডের সৃষ্টি করে। এই রকম এক-একখানি হাড়কে কশেরুকা (Vertebra) নাম দেওয়া হয়। আমাদের পিঠের মাঝ দিয়া যে মেরুদণ্ড মাথায় গিয়া ঠেকিয়াছে, তাহতে তেত্রিশখানি কশেরুকা অর্থাৎ টুক্‌রা হাড় আছে। পণ্ডিতেরা শরীরের গঠনের এই তফাৎটি ধরিয়া সমস্ত প্রাণীকে প্রথমেই অমেরুদণ্ডী (Invertebrata) এবং মেরুদণ্ডী (Vertebrata) এই দুইটি বড় দলে ভাগ করিয়াছেন।

মানুষের মেরুদণ্ড

এই দুইটি ভাগকে পণ্ডিতেরা গণ (Division) নাম দিয়াছেন। ইহার পরে তাঁহারা এই দুইটি গণের প্রাণীদের শরীরের গঠনের এবং স্বভাবের আরো ছোটোখাটো তফাৎ খুঁজিয়া সেগুলিকে অনেক ছোটো দলে ভাগ করিয়াছেন। মেরুদণ্ডী গণের প্রাণীদের মধ্যে কেহ শিশুকালে মায়ের দুধ খাইয়া বড় হয়; কেহ ডিম প্রসব করে এবং সেই ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হয়; কাহারো দেহ লোমে এবং কাহারো শরীর পালকে ঢাকা থাকে; কাহারো গায়ের রক্ত গরম এবং কাহারো রক্ত ঠাণ্ডা; কেহ ফুস্ ফুস্ দিয়া নিশ্বাস লয়, কেহ জল হইতে কান্‌কো দিয়া বাতাস টানিয়া নিশ্বাসের কাজ চালায়। তোমরা এই রকম নানা প্রাণী দেখ নাই কি? পণ্ডিতেরা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের আকৃতি-প্রকৃতির এই রকম তফাৎ খুব ভালো করিয়া দেখিয়াছেন এবং এই রকম দেখিয়া তাহা-দিগকে (১) মৎস্য (২) উভচর (৩) সরীসৃপ (৪) পক্ষী (৫) স্তন্যপায়ী, এই পাঁচটি ছোটো দলে ভাগ করিয়াছেন এবং সেই দলগুলিকে তাঁহারা শ্রেণী (Class) নাম দিয়াছেন। এই রকমে অমেরুদণ্ডী অর্থাৎ যাহাদের শরীরে হাড় নাই, সেই রকম প্রাণীদেরও (১) কবচী (২) ষট্‌পদী (৩) কোমলাঙ্গী, এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে।

কিন্তু এই রকম বড় বড় ভাগে প্রাণীদের চিনিবার এবং তাহাদের পরিচয় লইবার সুবিধা হয় না। তাই একই

শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেকার আরো ছোটোখাটো তফাৎ ধরিয়া তাহাদিগকে কতকগুলি বর্গে (Order) এবং বর্গকে গোষ্ঠীতে (Family), সেই সকল গোষ্ঠীকে জাতিতে (Genus) এবং জাতিকে উপজাতিতে (Species) ভাগ করা হইয়াছে। প্রাণীদিগকে এই রকমে ভাগ করার নিয়ম থাকায়, জন্তু-জানোয়ারদিগকে চিনিয়া লওয়া সহজ হইয়াছে। তা'ছাড়া কোনো একটি জন্তু কোন্ শ্রেণীতে, কোন্ বর্গে এবং কোন্ গোষ্ঠীতে পড়িবে তাহাও চট্ করিয়া বলার সুবিধা হইয়াছে।

মনে কর, সিংহ কোন্ দলের প্রাণী তাহা যেন তোমরা জানিতে চাহিতেছ। পণ্ডিতেরা বলিবেন, ইহার গণ—মেরুদণ্ডী, শ্রেণী—স্তন্যপায়ী, বর্গ—মাংসাশী, গোষ্ঠী—বিড়ালাদি, জাতি—সিংহ।

আমরা অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের বিবরণ “পোকামাকড়” নামক পুস্তকে দিয়াছি। আমরা এই বইয়ে তোমাদিগকে মেরুদণ্ডী প্রাণীদেরই কয়েকটি শ্রেণীর পরিচয় দিব।

মৎস্য

তোমরা মাছ অনেক দেখিয়াছ ; তবুও এখানে মাছের একটি ছবি দিলাম। ইহা রুই জাতি মাছের ছবি। মাছ জলে থাকে,

মাছ

ডাঙায় উঠাইলেই মরিয়া যায়, তাই ডাঙায় চলিয়া বেড়াইবার জন্য ইহাদের হাত-পা নাই।

যাহাতে সহজে জল কাটিয়া চলা-ফেরা করিতে পারে, তাহার জন্য মাছদের দেহের সম্মুখের ও পিছনের অংশ সরু। শরীরের অন্য অংশের চেয়ে যদি মাথাটা বা লেজটা মোটা হইত, তবে উহারা কখনই সহজে জল কাটিয়া চলা-ফেরা করিতে পারিত না।

সাধারণ জন্তুদের শরীরকে মাথা, ধড় এবং লেজ মোটামুটি এই তিনটা ভাগে ভাগ করা যায়। তোমরা কুকুর, বিড়াল,

বা অন্য যে-কোনো জন্তুর দিকে তাকাইলে ইহা দেখিতে পাইবে। ধড়ের সঙ্গে মাথাটা যেখানে জোড়া থাকে, তাহাকে আমরা গলা বলি। আবার লেজ জোড়া থাকে ধড়ের পিছনে। কুকুর, বিড়াল, পাখী সকলেরই মাথা ও ধড়ের মধ্যে সরু গলা থাকে। কিন্তু তোমরা মাছের ঐ রকম সরু গলা দেখিতে পাইবে না। শরীরের সম্মুখ হইতে কান্‌কো পর্য্যন্ত যে অংশ তাহাই ইহাদের মাথা।

মাছের চলা-ফেরা

মাছের ডানা তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ কি? ছোটো কই বা খলিসা মাছ বড়-মুখ-ওয়ালা বোতলের জলে রাখিয়া পরীক্ষা করিয়ো। বোতলের মুখ খুলিয়া রাখিয়ো, তাহা না হইলে মাছ মরিয়া যাইবে। ছবিতে যেমন ডানা দেখিতে পাইতেছ, বোতলের মাছে ঠিক্ সেই রকম ডানা দেখা যাইবে। এই সকল ডানা দিয়া মাছেরা জল কাটিয়া চলা-ফেরা করে।
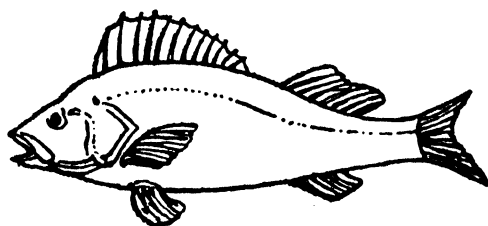
মাছের ডানা

মাছের পিঠের উপরে যে ডানা দেখিতে পাইতেছ, তাহাকে পৃষ্ঠ-পক্ষ (Dorsal Fins) অর্থাৎ পিঠের ডানা বলা হয়। রুই মাছে এই ডানা

একটা থাকে, কিন্তু কোনো কোনো মাছে দুইটা ডানা পর-পর পিঠের উপরে সাজানো দেখা যায়।

ছবির মাছে কান্‌কোর বাঁ-পাশে ও ডান-পাশে যে এক জোড়া ডানা দেখিতে পাইতেছ, তাহা বুকের কাছ হইতে বাহির হইয়াছে। এইজন্য ডানা দুইখানিকে বক্ষ-পক্ষ (Pectoral Fins) নাম দেওয়া হইয়া থাকে। প্রায় সকল মাছেই তোমরা দুইটা করিয়া এই রকম বক্ষ-পক্ষ দেখিতে পাইবে। মানুষের যেমন দুইখানা করিয়া হাত থাকে; এবং পাখীদের যেমন দুইখানা করিয়া পালকে ঢাকা ডানা থাকে, মাছদের বক্ষ-পক্ষ সেই রকমেরই অঙ্গ।

মানুষ ও পাখীদের হাত ও ডানাই একমাত্র অঙ্গ নয়, তাহাদের দুইখানি করিয়া পা থাকে। মাছদের অধঃপক্ষ দু'খানি যেন ঠিক্ সেই রকমেরই অঙ্গ। মাছের পেটের তলায় যে দুইটি ডানা দুই পাশে দেখিতেছ, আমরা তাহাকেই অধঃপক্ষ (Pelvic Fins) বলিতেছি। অধিকাংশ মাছেরই পেটের তলায় ইহা দুইটি করিয়াই থাকে।

পেটের তলায় লেজের কাছে তোমরা যে একটি ডানা দেখিতেছ, তাহা মাছদের মলদ্বারের নিকটে থাকে। এইজন্য উহাকে গুহ্য-পক্ষ (Anal Fins) বলা হয়। কিন্তু সকলের চেয়ে বড় ডানা থাকে মাছদের লেজের শেষে। ইহাকে লোকে ল্যাজা বা পোঁছা বলে। আমরা উহার নাম দিলাম পুচ্ছ-পক্ষ (Caudal Fins)।

তাহা হইলে দেখ, মাছদের ডানা অনেকগুলি। পিঠের উপরে একটা বা দু'টা, বুকের কাছে দু'টা, পেটের তলায় দু'টা, মলদ্বারের কাছে একটা এবং লেজে একটা।

মাছদের হাত নাই, পা নাই। অথচ তাহারা জলের ভিতর খুব তাড়াতাড়ি চলা-ফেরা করে। কেমন করিয়া তাহারা চলিয়া বেড়ায় তোমরা জানো কি? বোধ হয় জানো। আমরা সেই কথাটাই এখন তোমাদিগকে বলিব।

পুষ্করিণীর মাছ মরিয়া যখন জলে ভাসিয়া উঠে, তখন তাহা তোমরা দেখিয়াছ কি? তখন মরা মাছের পেট উপরের দিকে এবং পিঠ নীচের দিকে থাকিতে দেখা যায়। পিঠের দিকেই মাছের হাড়, কাঁটা ইত্যাদি থাকে। এইজন্য ইহাদের পিঠের দিকটাই পেটের চেয়ে বেশি ভারী। তাই, মাছ মরিলে পিঠ নীচে যায়। কিন্তু জ্যান্ত মাছ, কখনই পিঠ নীচে রাখিয়া চিৎ সাঁতার দেয় না। পৃষ্ঠ-পক্ষ এবং গুহ্য-পক্ষ দিয়াই তাহারা দেহ খাড়া রাখে।

বুকের ও পেটের তলার দুই জোড়া ডানাও মাছদের বিশেষ দরকারী। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, বক্ষ-পক্ষ অর্থাৎ বুকের দুইখানি ডানা ছিঁড়িয়া ফেলিলে মাছের মাথা নীচু হইয়া যায়। সে তখন আর মাথা সোজা রাখিয়া সাঁতরাইতে পারে না। দু'খানি ডানা না ছিঁড়িয়া যদি এক পাশের ডানা ছেঁড়া যায়, তাহা হইলে মাছের শরীর সেই পাশে হেলিয়া পড়ে। বুকের ও পেটের তলার সব

ডানাগুলিকে ছিঁড়িয়াও পরীক্ষা করা হইয়াছে। এই অবস্থায় দেখা যায়, মাছ আর পিঠ উঁচু করিয়া থাকিতে পারে না। তখন তাহার সমস্ত শরীর উল্‌টাইয়া পেট উপরে এবং পিঠ নীচে আসিয়া পড়ে।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, শরীরটাকে খাড়া রাখিবার জন্যই বুঝি মাছদের ডানার প্রয়োজন। কিন্তু তাহা নয়,—ডানা না থাকিলে মাছেরা একেবারেই চলা-ফেরা করিতে পারে না। বুকে ও পেটের দুই জোড়া ডানা নৌকার দাঁড়ের মতো চালাইয়া তাহারা সাঁতার দেয় এবং আশেপাশে ফিরিবার সময়েও ব্যবহার করে। কিন্তু কেবল এই ডানাগুলি দিয়া তাহারা খুব তাড়াতাড়ি চলিতে পারে না। পুচ্ছ-পক্ষ অর্থাৎ লেজের ডানা দিয়াই মাছেরা তাড়াতাড়ি সাঁতার দেয়। নৌকার পিছনকার কেবল একখানি দাঁড়ে মোচড় দিয়া, মাঝিরা কি-রকমে নৌকা চালায়, তাহা তোমরা দেখিয়াছ কি? এই রকমে নৌকা চালানো লক্ষ্য করিলে দেখিবে দাঁড়খানিতে মোচড় দিয়া মাঝিরা যেন জলের উপরে ∞ এর মতো এক-একটি দাগ কাটিয়া চলিয়াছে। এই প্রকার মোচড়ে নৌকা খুব তাড়াতাড়ি সম্মুখে চলিতে আরম্ভ করে। মাছেরা ঠিক্ এই রকমেই পুচ্ছ-পক্ষ ও লেজের ডানায় মোচড় দিয়া জলের ভিতরে তাড়াতাড়ি চলা-ফেরা করে। তাহা হইলে দেখ, লেজের ডানা না থাকিলে মাছদের জল কাটিয়া চলিবার ক্ষমতা থাকিত না।

রুই, কাত্‌লা, মির্‌গেল প্রভৃতি মাছ কাটিলে তাহাদের পেটের ভিতরে এক-একটা পট্‌কা (Air Bladder) দেখা যায়। এমন কি পুঁঠি প্রভৃতি ছোটো মাছেরও পেটে পট্‌কা আছে। ইহাও সাঁতরাইবার সুবিধার জন্য মাছদের শরীরে থাকে। রক্ত হইতে এক রকম বাষ্প জন্মিয়া সর্ব্বদাই পট্‌কায় জমা থাকে। আমরা যেমন বাতাসে-ভরা কলসী বুকে দিয়া জলে স্থির হইয়া ভাসিতে পারি, মাছেরাও সেই রকম বাষ্পে-ভরা পট্‌কা পেটের ভিতরে রাখিয়া শরীরটাকে হাল্‌কা করিয়া জলে ভাসিতে পারে। কেবল ইহাই নয়,—দরকার হইলে পট্‌কার উপরে চাপ দিয়া তাহারা সেটিকে ইচ্ছামতো ছোটো-বড়ও করিতে পারে। তাই দরকার মতো উপরে উঠিতে বা নীচে নামিতে মাছদের একটুও কষ্ট হয় না। যে-সব মাছের পট্‌কা নাই, তাহারা প্রায়ই জলের তলায় পাঁকে থাকিয়া জীবন কাটায়। ইহারা সহজে জলে ভাসিতে পারে না। বোতলে-ভরা খলিসা মাছ, ডানা বা লেজ না নাড়িয়া জলের ভিতরে স্থির হইয়া রহিয়াছে, ইহা তোমরা দেখ নাই কি? পেটের ভিতরকার পট্‌কাকে ফুলাইয়া উহারা এই রকমে ভাসিতে পারে।

মাছের আঁশ

গরু, ভেড়া ইত্যাদি জানোয়ারের শরীরে লোম থাকে এবং

পাখীদের শরীর পালক দিয়া ঢাকা থাকে। ইহাতে শীতে-হিমে এই সব প্রাণীর শরীর গরম থাকিয়া যায়। তা' ছাড়া বৃষ্টির জলও পালক ও লোমকে ভিজাইয়া হঠাৎ গায়ে ঠেকিতে পারে না। মাছেরা জলের ভিতরে বাস করে। তা' ছাড়া মানুষ, গরু, ঘোড়া, পাখী প্রভৃতি প্রাণীর গায়ের রক্ত যেমন গরম, মাছদের রক্ত সে-রকম গরম নয়। কাজেই, শরীরকে গরম রাখা ইহাদের দরকারই হয় না। তাই মাছদের গায়ে লোম বা পালক থাকে না,—আঁশই ইহাদের শরীরের একমাত্র আবরণ। তাহাও আবার সব মাছের গায়ে থাকে না।

মানুষের সঙ্গে মানুষের যেমন লড়াই চলে, এক জাতি মাছের সঙ্গে আর এক জাতি মাছের অনেক সময়ে সেই রকম মারামারি-হানাহানি চলে। তা'ছাড়া হাঙ্গর, কুমীর প্রভৃতি বলবান্ জলচরেরা দুর্ব্বল মাছদের উপরে অত্যাচার করিতে ছাড়ে না। এই রকম মারামারি-লড়ালড়িতে যাহাতে শরীরে হঠাৎ আঘাত না লাগে, তাহার জন্যও মাছদের শরীর আঁশে ঢাকা থাকে।

আঁশগুলি মাছের গায়ে কি-রকমে সাজানো থাকে তোমরা তাহা একবার লক্ষ্য করিয়ো। টালির ঘরের ছাদে আমরা টালিগুলিকে যেমন একটির উপরে আর একটিকে সাজাইয়া রাখি, মাছদের গায়ের আঁশগুলি যেন কতকটা সেই রকমে সাজানো থাকে। মাছের ছালে আমাদের

জামার পকেটের মতো অনেক ছোটো পকেট্ থাকে, আঁশগুলির গোড়া সেই সব পকেটের মধ্যে গোঁজা দেখা যায়।

টাট্কা মাছের গায়ে তোমরা হাত দিয়া দেখিয়াছ কি? গায়ে হাত দিলেই গা পিছল বলিয়া বোধ হয়। আঁশের উপরে লালার মতো এক-রকম জিনিষ লাগানো থাকে বলিয়াই, মাছদের গা পিছল। ইহাও শত্রুর হাত হইতে উদ্ধার পাইবার আর একটি উপায়। গায়ে লালা লাগানো থাকে বলিয়া অন্য প্রাণীরা ধরিতে গেলে তাহারা পিছ্লাইয়া পালাইতে পারে। যে-সব মাছের গায়ে আঁশ থাকে না, তাহাদেরো গায়ে লালা লাগানো দেখা যায়। মাগুর, জিয়ল প্রভৃতি মাছের আঁশ নাই, কিন্তু গায়ে লালা লাগানো আছে। তাই এই সব মাছ ধরা কঠিন,—ধরিতে গেলেই হাত হইতে পিছ্লাইয়া পালাইয়া যায়।

তোমরা সাধারণ মাছের গায়ের রঙ্ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ কি? এবারে রুই-কাত্লা প্রভৃতি মাছ কাছে পাইলে লক্ষ্য করিয়ো। দেখিবে, উহাদের পিঠের দিক্টার রঙ্ কালো এবং পেটের দিক্টার রঙ্ কতকটা ফিকে। উপর হইতে নদী বা পুকুরের জলের দিকে তাকাইলে জল কালো দেখায় না কি? মাছেরা যখন সাঁতার কাটে, তখন তাহাদের কালো পিঠ কালো জলের সঙ্গে এক-রঙা হইয়া যায়, তাই উপর হইতে চিল্ প্রভৃতি পাখীরা মাছকে চিনিয়া লইয়া ছোঁ মারিতে পারে না। তাহা হইলে বলিতে হয়, এই সব

মাছের পিঠের কালো রঙ্ তাহাদের আত্মরক্ষার জন্যই আছে।

খলিসা মাছ তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। ইহাদের গায়ের আঁশের নানা রঙের আভা দেখা যায়। ঠিক্ যেন রামধনুর রঙ্! তা ছাড়া চীনা মাছ ও সমুদ্রের নানা রকম মাছের গা চিত্র-বিচিত্র করা দেখা যায়। এই সব মাছের গায়ে রঙের এত বাহার কেন, তাহা ভালো বুঝা যায় না। কিন্তু স্ত্রী-মাছের চেয়ে পুরুষ-মাছের গায়েই রঙের চটক বেশি।

মাছের আহার

মাছের চলা-ফেরা এবং তাহাদের বাহিরের আকৃতি-প্রকৃতির কথা বলিলাম। এখন মাছেরা কি খায় এবং কেমন করিয়া খায়, তাহা তোমাদিগকে বলিব।

ঈশ্বর যে-সব জন্তুকে নড়া-চড়ার শক্তি দিয়াছেন, তাহা-দিগকে চেষ্টা করিয়া খাবার জোগাড় করিতে হয়। মাছেরা ডানা নাড়িয়া জলের ভিতরে খুব চলা-ফেরা করে, এজন্য তাহাদিগকেও চেষ্টা করিয়া খাবার সংগ্রহ করিতে হয়। অনেক বড় প্রাণী কেবল ঘাস ও লতা-পাতা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। গরু, ঘোড়া, ছাগল, উট, ইহারা সকলেই ঘাস, পাতা, ফল ইত্যাদি খায়। আবার বাঘ, সিংহ, চিল, শকুন প্রভৃতি জন্তুরা অন্য প্রাণীর মাংস ভিন্ন আর কিছু খাইতে চাহে না। মাছদের মধ্যে কিন্তু কতকগুলিকে আমিষ এবং কতক-

গুলিকে নিরামিষ খাইতে দেখা যায়। যে সব রঙিন্ চীনা-মাছ আমরা চৌবাচ্চায় রাখিয়া পুষি, তাহারা কেবল পচা শেওলা ও পচা লতা-পাতা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে! আবার বোয়াল, চিতল প্রভৃতি মাছদের আমিষ না খাইলে একদিনও চলে না। তাই, ইহাদের অত্যাচারে পুকুরে ছোটো মাছদের বাস করা কঠিন হয়। ছোটো মাছ দেখিলেই ইহারা সেগুলিকে ধরিয়া খাইয়া ফেলে। এবারে যখন তোমরা বোয়াল মাছ কাছে পাইবে, তাহার মুখের ভিতরটা পরীক্ষা করিয়ো,—দেখিবে, টাক্‌রায় অনেক ছোটো দাঁত সাজানো আছে। দাঁতগুলি আবার বঁড়শির মতো ভিতরের দিকে বাঁকানো। তাই, একবার সেই সব দাঁত দিয়া চাপিয়া ধরিলে, কোনো মাছই পিছ্‌লাইয়া পালাইতে পারে না। রুই, কাত্‌লা প্রভৃতি মাছ আমিষ এবং নিরামিষ দুই রকম খাবারই খায়। উহাদের মুখে কিন্তু ঐ রকম দাঁত থাকে না। তাহাদের দাঁত থাকে গলার ভিতরে। যে-সব মাছ আমিষ ছাড়া অন্য খাবার পছন্দ করে না, তাহাদেরি মুখে কেবল বোয়াল মাছের মতো দাঁত দেখা যায়।

হরিণ ধরিয়া খাইবার জন্য বাঘ তাহার পিছনে ছুটিতে থাকে। হরিণ প্রাণভয়ে পালাইতে চেষ্টা করে। পাখীর মাংস খাইবার জন্য বিড়াল নিরীহ পাখীর উপরে লাফাইয়া পড়ে; পাখী তখন উড়িয়া প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করে। আহারের জন্য এবং প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এই রকম ছুটাছুটি-

মারামারি আমরা দিবারাত্রিই দেখিতে পাই। জলের ভিতরে কি হইতেছে, তাহা আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু সেখানেও ডাঙার মতো রক্তারক্তি কাম্‌ড়া-কাম্‌ড়ি দিবারাত্রি চলে।

রাত্রিতে আলো জ্বালিলে অনেক পোকামাকড় আলোর কাছে জমা হয়। ইহা তোমরা নিশ্চয় দেখিয়াছ। জোনাকি-পোকার পিছনে আলো থাকে। সেই আলো দেখিয়া যখন খুব ছোটো পোকা কাছে আসে, তখন জোনাকিরা সেই সব পোকা ধরিয়া খায়। সমুদ্রের এক জাতি মাছ এই রকমে শরীর হইতে আলো বাহির করিয়া ছোটো মাছ ও জলের পোকাকে কাছে ডাকিয়া আনে এবং তা'র পরে সেগুলিকে খাইতে আরম্ভ করে। এখানে সেই মাছের একটা ছবি দিলাম। এই মাছ সমুদ্রের তলায়
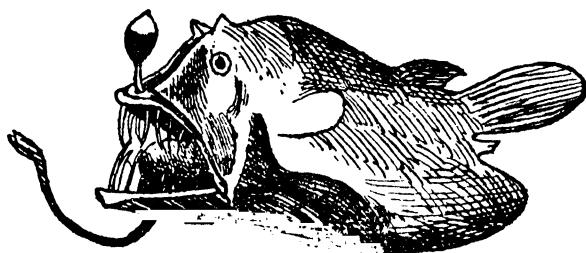
জোনাকি-মাছ

অন্ধকারের মধ্যে থাকে; কাজেই, সহজে শিকার খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না। তাই ইহাদের ওষ্ঠের উপরকার

একটা শুঁয়োর ডগা হইতে জোনাকির আলোর মতো আলো বাহির হইতে থাকে।

মাছের পাকযন্ত্র

আমরা যাহা খাই, তাহা পেটের ভিতরে গিয়া নানা উপায়ে হজম হয়। তা'র পরে সেই হজম-করা খাবার হইতে রক্ত, মাংস,

মাছের পাকযন্ত্র

হাড় ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। মাছেরা যাহা খায় তাহা হইতেও ঐ রকমে রক্ত, মাংস উৎপন্ন হয়।

শরীরের ভিতরকার যে-যন্ত্র দিয়া মাছেরা খাবার হজম করে, এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম। ইহাকে পাক-যন্ত্র বলা হয়। মাছ যাহা খায়, তাহা গলা দিয়া নামিয়া প্রথমে ছবির নীচেকার মোটা নলটিতে গিয়া পড়ে। এটি, বেশি লম্বা নয়। ইহাই মাছের উদর। উদরের শেষ প্রান্তে আবার একটি সরু নল লাগানো আছে দেখিতে পাইবে।

ইহার নাম অন্ত্র (Intestine)। অন্ত্র খুব লম্বা নল। আমরা যেমন লম্বা সূতাকে গুটাইয়া ফেটা বাঁধিয়া রাখি, অন্ত্র পেটের ভিতরে সেই রকম ফেটার মতো গুটানো থাকে। তাই এত লম্বা নল মাছের ছোটো পেটের ভিতরে থাকিতে পারে। মাছের মলদ্বার থাকে এই নলেরই শেষ প্রান্তে।

যাহা হউক, খাদ্য উদরে গিয়া কিছু হজম হইলে, তাহা অন্ত্র অর্থাৎ ঐ ছোটো নলে আসিয়া পড়ে। অন্ত্রের গায়ে কয়েক জায়গায় এক রকম মাংস-গ্রন্থি (Glands) থাকে। সেখানে কয়েক রকম রস উৎপন্ন হইয়া আপনিই অন্ত্রের ভিতরকার খাবারে আসিয়া পড়ে। খাবারে এই সকল রস মিশিলেই, তাহা খুব ভালো করিয়া হজম হয়।

তোমরা যকৃতের (Liver) নাম বোধ হয় শুনিয়াছ। ইহা প্রায় সকল বড় প্রাণীরই শরীরের ভিতরে আছে। যকৃতে পিত্তরস নামে একটা রস আপনিই উৎপন্ন হয়। ইহা একটা সরু নল দিয়া অন্ত্রের ভিতরকার খাবারে মিশিলেই হজমের কাজ শেষ হয়। তাহার পরে, অন্ত্রের গায়ের রক্তকোষগুলি হজম-করা খাদ্যের সার জিনিষটুকু চুষিয়া শরীরকে পুষ্ট করে।

হজমের কাজে পিত্তরসে খুবই দরকার। মাছের পেটের ভিতরে কোথায় যকৃত থাকে, তাহা ছবিতে দেখিতে পাইবে। হজমের কাজ শেষ হইলে যে-পিত্তরস উদ্বৃত্ত থাকে তাহা যকৃতের উপরকার পিত্তকোষে জমা হয়।

তোমরা মাছের পিত্তকোষ অর্থাৎ পিত্তের থলি দেখ নাই কি? বড় রুই মাছ বা কাত্‌লা মাছ কুটিবার সময়ে যকৃতের উপরে পিত্তকোষ দেখা যায়। পিত্তের স্বাদ ভয়ানক তিক্ত। পিত্তের থলি গলিয়া রস মাছে লাগিলে মাছ তিতো হইয়া পড়ে।

নিশ্বাস-প্রশ্বাস

বাহিরের বাতাস শরীরের ভিতরে না টানিলে কোনো জন্তুই বাঁচে না। আমরা নাক-মুখ দিয়া বাতাস টানি; অনেক পোকামাকড় গায়ের উপরকার ছিদ্র দিয়া নিশ্বাস টানে। হাত দিয়া নাক-মুখ কিছুক্ষণ বন্ধ রাখিলে আমাদের কি-রকম কষ্ট হয়, তোমরা দেখ নাই কি? তখন দম আট্‌কাইয়া আসে। অনেকক্ষণ দম বন্ধ থাকিলে প্রাণীরা মারা যায়।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, মাছেরা জলের ভিতরে থাকে, তাই তাহাদের নিশ্বাস লইবার দরকার নাই। কিন্তু তাহা নয়; ইহাদেরো বাতাস শরীরের ভিতরে টানিয়া লওয়ার দরকার হয়। জলের সঙ্গে অনেক বাতাস মিশানো থাকে। মাছেরা জল হইতে সেই বাতাস টানিয়া নিশ্বাসের কাজ চালায়।

যাহা হউক, মাছেরা কি-রকমে নিশ্বাস লয়, তাহা বলিবার আগে, বাতাস নিশ্বাসের সঙ্গে শরীরে ভিতরে গিয়া

কি কাজ করে তাহা তোমাদিগকে বলিব। আমরা সকলেই ফোঁস্-ফাঁস্ করিয়া নিশ্বাসের সঙ্গে বাতাস টানি এবং প্রশ্বাসের সঙ্গে আবার শরীরের ভিতরকার বাতাস ছাড়িয়া দিই। ঘুমের সময়েও নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ থাকে না,—ইহাতে শরীরের কি কাজ হয়, তোমাদের জানিতে ইচ্ছা হয় না কি ?

আমাদের চারিদিক্ ঘিরিয়া এই যে বাতাস রহিয়াছে, ইহা যে কি জিনিস, তাহা বোধ হয় তোমরা সকলে জানো না। এক শত ভাগ বাতাসের মধ্যে প্রায় কুড়িভাগ অক্সিজেন্ নামে একটা বাষ্প থাকে। বাকি আশীভাগের মধ্যে উনআশীভাগ নাইট্রোজেন্ নামে আর একটা বাষ্প থাকে এবং এক ভাগ আন্দাজ অঙ্গারক বাষ্প ও জলের বাষ্প ইত্যাদি থাকে। কাচ যেমন স্বচ্ছ, জল যেমন স্বচ্ছ—এই সব বাষ্পও তেমনি স্বচ্ছ। তাই, এই সব বাষ্প দিয়া যে-বাতাস তৈয়ারী হয়, তাহাও স্বচ্ছ। এই জন্য বাতাসকে আমরা চোখে দেখিতে পাই না। তাহা হইলে দেখ, আমাদের চারিদিকের বাতাসে অনেক অক্সিজেন্ ও নাইট্রোজেন্ আছে। তা' ছাড়া কিছু অঙ্গারক বাষ্প ও জলের বাষ্পও আছে।

বাতাসের যে অক্সিজেন্ বাষ্পের কথা তোমাদিগকে বলিলাম, তাহা প্রাণীর বড় উপকারী জিনিষ। অঙ্গারক বাষ্প সে-রকম নয়। ইহা এক রকম বিষ-বায়ু। যখন

কাঠ বা কয়লা আগুনে পুড়িতে থাকে, তখন কাছের বাতাসের অক্সিজেন্ কাঠের বা কয়লার সহিত মিলিয়া অঙ্গারক বাষ্প হইয়া দাঁড়ায়। দরজা-জানালা-বন্ধ-করা ঘরের ভিতরে আগুন জ্বালিয়া রাখায় ঘরের লোক মারা গিয়াছে, ইহা বোধ হয় তোমরা শুনিয়াছ। ইহা অঙ্গারক বাষ্পেরই কাজ। এই বিষ-বায়ু নিশ্বাসের সঙ্গে শরীরের ভিতরে গিয়া মানুষকে মারে। কিন্তু এক শত ভাগ বাতাসে কেবল এক ভাগ মাত্র অঙ্গারক বাষ্প থাকে, তাই তাহা আমাদের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না। বাতাসে ইহার বেশি অঙ্গারক বাষ্প থাকিলে পৃথিবীতে হয় ত একটিও মানুষ বা অপর জন্তু-জানোয়ার থাকিত না। বাতাসে যে ৭৯ ভাগ নাইট্রোজেন্ বাষ্প আছে, তাহা শরীরের ভালো বা মন্দ কোনো কাজই করে না।

বাহিরের বাতাস নাক-মুখ দিয়া শরীরের ভিতরে টানিয়া লইলে কি হয়, এখন তাহা দেখা যাউক। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, জন্তু-জানোয়ারেরা নিশ্বাসের সঙ্গে যে-বাতাস শরীরের ভিতরে টানিয়া লয়, তাহার সকল অক্সিজেনই শরীরে থাকিয়া যায়। তাই নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে যাহা শরীর হইতে বাহির হয়, তাহাতে নাইট্রোজেন্, জলীয় বাষ্প ও অঙ্গারক বাষ্প ছাড়া আর কিছুরই খোঁজ পাওয়া যায় না। বাতাসের অক্সিজেন এই রকমে শরীরের ভিতরে আট্কাইয়া থাকিয়া কি কাজ করে, তাহাও জানা গিয়াছে।

পণ্ডিতেরা বলেন, বাতাসের অক্সিজেন্ নিশ্বাসের সঙ্গে প্রথমে প্রাণীদের শ্বাসযন্ত্র অর্থাৎ ফুস্‌ফুসে যায়। তা'র পরে সেখানে যে-সব খুব ছোটো বায়ুকোষ আছে তাহাতে উহা সঞ্চিত হয়। তা'র পরে সেখানে খুব ছোটো ছোটো নলের মতো যে-সব শিরা দিয়া রক্ত চলাচল করে সেগুলি অক্সিজেন্‌কে চুষিয়া লইয়া রক্তের কাছে পৌঁছাইয়া দেয়। জলের স্রোতের মতো রক্তের স্রোত দিবারাত্রিই প্রাণীদের দেহের ভিতর দিয়া চলাচল করে। কাজেই রক্ত সেই অক্সিজেন্ বহিয়া লইয়া সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া দেয়। তা'র পরে, তাহা দেহের কোষের ভিতরে পেঁ ৗছিলে এবং অন্ত্রের ভিতরকার খাদ্যের সঙ্গে মিশিলে প্রাণীর শরীরে বল হয়। প্রাণীদের উঠা-বসা, চলা-ফেরা সব কাজেই বলের দরকার। যাহার শরীরে বল নাই, তাহাকে মড়া বলিলেই চলে। তাহা হইলে দেখ, প্রাণীরা বাতাস হইতে যে অক্সিজেন্ টানিয়া লয় তাহা বাঁচিয়া থাকার জন্য কত দরকার।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, নিশ্বাসের অক্সিজেন্ প্রাণীদের শরীরের কোষের সহিত মিশিয়া সেখানেই থাকিয়া যায়। কিন্তু তাহা নয়। অঙ্গার কাহাকে বলে, তোমরা বোধ হয় জানো। আমরা যাহাকে কয়লা বলি, তাহাই অঙ্গার। প্রাণীর শরীরে ও খাদ্যে গাছ-পালায় অনেক অঙ্গার আছে। তাই গাছ-পালা পোড়াইলে এবং প্রাণীর দেহ পোড়াইলে কয়লা পাওয়া যায়। প্রাণীর ও গাছের দেহের

অঙ্গার অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে মিশিয়া থাকে বলিয়া, তাহাকে কয়লা বলিয়া চেনা যায় না। নিশ্বাসের অক্সিজেন্ শরীরের ভিতরকার অঙ্গারের সহিত মিশিয়াই শক্তির উৎপত্তি করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা অঙ্গারক বাষ্প ও জলীয় বাষ্প হইয়া পড়ে। অঙ্গারক বাষ্প বড় খারাপ জিনিষ, তাহা রক্তে থাকিলে প্রাণীরা বাঁচে না। তাই রক্তই চুষিয়া লইয়া তাহাকে প্রাণীদের হৃদ্‌পিণ্ডে আনিয়া হাজির করে, এবং সেখান হইতে তাহা শ্বাস-যন্ত্রে আসিয়া প্রশ্বাসের সঙ্গে শরীর হইতে বাহিরে আসে। এই জন্যই মানুষ এবং অন্য প্রাণীরা প্রশ্বাসের সঙ্গে যে-বাতাস শরীর হইতে বাহির করে, তাহাতে অনেক অঙ্গারক বাষ্প ও জলীয় বাষ্প মিশানো দেখা যায়।

মাছের নিশ্বাস প্রশ্বাস

সাধারণ জন্তু-জানোয়ার যে-রকমে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিয়া শরীরে বলের সঞ্চার করে, তাহা তোমাদিগকে বলিলাম। এখন মাছেরা কি-রকমে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায়, তাহা তোমাদিগকে বলিব।

মানুষ, গরু, ভেড়া, সাপ প্রভৃতি জন্তুরা যেমন নাক দিয়া বাতাস টানিয়া তাহা শরীরের ভিতরকার ফুস্‌ফুসে লইয়া যায়, মাছেরা তাহা করে না। ইহাদের দেহে ফুস্‌ফুস্ নাই, নিশ্বাস টানার জন্য নাকও নাই এবং চারিদিকে বাতাসও নাই। তাই ইহাদের শ্বাসযন্ত্র একটা সৃষ্টিছাড়া জিনিষ।

মাছের এই যন্ত্রটি তোমরা দেখ নাই কি? মাথার দুই পাশে যে দুইটি ঢাক্‌নি-ওয়ালা কান্‌কো (Gill) থাকে তাহাই মাছদের শ্বাসযন্ত্র। কোনো টাট্‌কা মাছের কান্‌কোর ঢাক্‌নি উঠাইয়া তোমরা পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, ভিতরে কয়েকটি চাকার মতো লাল জিনিস থাকে-থাকে সাজানো আছে,—ইহাকেই আমরা কান্‌কো বলিতেছি। এগুলি নিরেট মাংস দিয়া প্রস্তুত নয়, চিরুণীর দাঁতের মতো নরম হাড় দিয়া তৈয়ারি। হাড়গুলির উপরে আবার রক্তে-ভরা অসংখ্য উপশিরা থাকে। তাই টাট্‌কা মাছের কান্‌কোকে রক্তের মতো লাল টক্‌টকে দেখায়।
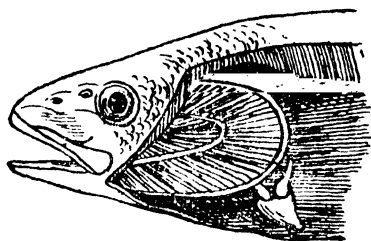
মাছের শ্বাসযন্ত্র

যাহা হউক, যে-রকমে কান্‌কো দিয়া মাছেরা অক্সিজেন্ টানিয়া লয়, তাহা বড় মজার। তোমরা বোতলে-ভরা মাছ লইয়া পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, মাছগুলা একবার হাঁ করিয়া মুখে জল ভরিতেছে এবং তখনই মুখ বুঁজিতেছে। মাছদের এই রকম মুখ বোঁজা ও খোলা অবিরাম চলে। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় বুঝি মাছেরা জল খাইতেছে। কিন্তু তাহা নয়। ইহাই তাহাদের নিশ্বাস লওয়া। মাছেরা খানিকটা পরিষ্কার জল মুখে পুরিয়াই মুখ বুঁজিয়া ফেলে। ইহাতে মুখের জল জোরে কান্‌কোর উপর দিয়া চলিয়া এবং কান্‌কোর

ঢাক্‌নি খুলিয়া বাহিরে আসে। কাজেই মুখ বোঁজা ও খোলার সঙ্গে সঙ্গে কান্‌কোর উপর দিয়া একটা জলের স্রোত ক্ষণে ক্ষণে চলিতে থাকে। কান্‌কোর উপরে যে রক্ত-ভরা উপশিরা থাকে, সেগুলি এই সুযোগে জলে মিশানো বাতাস হইতে অক্সিজেন্ চুষিয়া লইয়া, তাহা সর্ব্বাঙ্গে চালান করিয়া দেয়।

ইহার পরে কি হয়, তাহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি,—রক্তের অক্সিজেন্ খাদ্যের সঙ্গে ও শরীরের কোষের সঙ্গে মিলিয়া শক্তির সৃষ্টি করে। ইহাতেই মাছেরা লেজ নাড়িয়া, ডানা মেলিয়া জলের ভিতরে ছুটাছুটি জুড়িয়া দেয়।

মাছদের নিশ্বাস লওয়া মজার ব্যাপার নয় কি? বোতলের জলে কই বা খলিসা মাছ রাখিয়া পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, জল মুখে পুরিয়া মুখ বন্ধ করিবামাত্র, তাহাদের মাথার দুই পাশের কান্‌কোর ঢাক্‌নি খুলিয়া যাইতেছে।

জল হইতে উঠাইলে, মাছ কেন মরিয়া যায়, তাহা বোধ হয় তোমরা এখন বুঝিতে পারিতেছ। ডাঙায় আসিলেই মাছের সেই চাকার মতো কান্‌কোগুলি গায়ে-গায়ে লাগিয়া যায়। চারিদিকের বাতাসে অক্সিজেন্ থাকে বটে, কিন্তু কান্‌কো দিয়া মাছেরা তখন আর সেই অক্সিজেন্ টানিয়া লইতে পারে না। কাজেই মাছদের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে তাহারা মারা পড়ে।

মাছের শরীরে রক্ত-চলাচল

মাছেরা কি-রকমে নিশ্বাস লয়, তাহা বলিলাম। তাহাদের শরীরের ভিতরে কি-রকমে রক্ত চলাফেরা করে এখন তাহাই তোমাদিগকে বলিব। ছুরিতে একটা আঙুল কাটিলেই রক্ত বাহির হয়; কাঁটার খোঁচা গায়ে লাগিলে খোঁচা-লাগা জায়গাতে রক্ত দেখা যায়। এই রক্ত কি-রকমে শরীরে থাকে, ইহা তোমাদের জানিতে ইচ্ছা করে না কি?

বড় বড় সহরে কি-রকমে কলের জল লোকের বাড়ীতে যায়, তাহা তোমরা সকলে হয় ত দেখ নাই। নদী বা বড় জলাশয়ের ধারে কল পাতা হয় এবং তা'র পরে কল দিয়া নদীর জল একটা উঁচু ও বড় চৌবাচ্চার উপরে উঠানো হয়। চৌবাচ্চার তলায় মোটা মোটা নল লাগানো থাকে। এই নলগুলি সহরের সমস্ত রাস্তার পাশ দিয়া যায়। মাটির তলায় পোঁতা থাকে বলিয়া আমরা সেগুলিকে দেখিতে পাই না। উঁচু চৌবাচ্চার জল উপর হইতে নামিয়া এই সব নলের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলে।

এখন যদি কোনো বাড়ীতে কলের জল লইয়া যাইবার দরকার হয়, তবে রাস্তার মোটা নলের সঙ্গে ছোটো-ফাঁক-ওয়ালা নল যোগ করিয়া দিতে হয়। এই রকমে রাস্তার মোটা নলের জল সরু নল দিয়া লোকের বাড়ী-বাড়ী হাজির হয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সহরে জল জোগাইবার মূল কারখানা থাকে সেই জলাশয়ের ধারে—কলে। কল দুম্‌দাম্ শব্দ করিয়া নদী হইতে জল চৌবাচ্চায় উঠায় এবং কখনো কখনো চৌবাচ্চার জলের উপরে চাপ দেয়। এই জন্য উপরকার জল পিচ্‌কারির জলের মত মোটা নল দিয়া চলিয়া লোকের বাড়ীর সরু সরু নলে গিয়া হাজির হয়।

প্রাণীদের শরীরের ভিতর দিয়া রক্ত কতকটা কলের জলের মতোই চলাচল করে। সহরে কলে জল জোগাইতে গেলে যেমন রাস্তায় ও বাড়ীতে মোটা ও সরু নল লাগাইতে হয়, সেই রকম প্রাণীদের শরীরে রক্ত চলাচলে জন্য তিন রকম নল পাতা থাকে। প্রথম নলের ধমনী (Artery)। এগুলি বেশ মোটা এবং রবারের মতো জিনিস দিয়া প্রস্তুত। ইহাই রক্ত চলাচলের প্রধান নল। অসুখ করিলে ডাক্তারবাবু আসিয়া যখন তোমার হাতের নাড়ী টিপিয়া দেখেন, তখন তোমার হাতের একটা ধমনীতেই আঙুল লাগান। ধমনী দিয়া রীতিমত রক্ত চলিতেছে কি না, ইহাতে তিনি বুঝিয়া লন। দ্বিতীয় নলের নাম শিরা (Vein)। এগুলি চাম্‌ড়ার নীচেই ধমনীর কাছে থাকে। সহরের নোংরা জল যেমন নর্দ্দামা দিয়া বহিয়া যায়, শিরার ভিতর দিয়া সেই রকমে শরীরের বদ্‌-রক্তের স্রোত চলে। অসুখের পরে শরীর কাহিল থাকিলে, হাতের উপরে যে নীল রঙের শির দেখা যায়, সেইগুলিকেই আমরা শিরা বলিতেছি। তোমরা ইহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ।

প্রাণীদের শরীরের তৃতীয় নলের নাম উপশিরা (Capillaries)। এগুলি অতি সরু নল। প্রাণীদের সব দেহই এই সকল নলে আচ্ছন্ন। কিন্তু সেগুলিকে কখনই এলোমেলো-ভাবে সাজানো দেখা যায় না। উপশিরাগুলি ধমনী হইতে বাহির হইয়া কাছের শিরায় গিয়া শেষ হয়। এক নদী হইতে অন্য নদীতে যাইবার জন্য যেমন আমরা খাল কাটিয়া দুই নদীকে যোগ করি, উপশিরাগুলি যেন সেই-রকম খাল; সেগুলি ধমনী ও শিরাকে সংযুক্ত রাখে।

তোমরা যদি ধমনী, শিরা ও উপশিরা এই তিন প্রকার নলের কথা বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে কি-রকমে প্রাণীদের শরীরে রক্ত চলাচল করে, তাহা বুঝিতে পারিবে। কলের জল সহরের সব জায়গায় চালাইতে গেলে সকলের আগে জল পম্প্ করার একটা কলের দরকার। সকল অঙ্গে রক্ত চালাইবার জন্য প্রাণীর দেহের ভিতরে ঠিক্ সেই-রকম কল আছে। ইহার নাম বোধ হয় তোমরা সকলে জানো না,—ইহাকে হৃদ্‌পিণ্ড (Heart) বলা হয়। মানুষের হৃদ্‌পিণ্ড বুকের চারি-পাঁচখানা হাড়ের নীচে থাকে। সেটি নিতান্ত ছোটো জিনিষ নয়,—তোমাদের হাতের মুঠোর মতো বড়। বুকে হাত দিয়া দেখিয়ো, দেখিবে তোমাদের শরীরের রক্ত পম্প্ করার জন্য এই কলটি দিবারাত্রি টিপ্ টিপ্ করিয়া চলিতেছে। তোমরা যখন ঘুমাও তখনো সেই কলের কাজ বন্ধ থাকে না।

যাহা হউক, এই কলই পম্প্ করিয়া রক্তকে ধমনী দিয়া চালাইতে থাকে। কিন্তু ধমনীর সঙ্গে অনেক উপশিরার যোগ থাকে। কাজেই ধমনীর রক্ত উপশিরাগুলিতে যায়। উপশিরাগুলির রক্ত যে কাজ করে তাহা অতি আশ্চর্য্য। উপশিরার রক্তই আমাদের খাদ্যের সার জিনিষকে টানিয়া আনিয়া পাশের কোষে প্রবেশ করায় এবং কোষে যে-সব আবর্জ্জনা জমা থাকে, তাহা টানিয়া বাহির করে। তাহা হইলে দেখ, যে-সব খুব ছোটো কোষ দিয়া প্রাণীদের দেহ তৈয়ারী, সেটিকে পুষ্ট করার কাজ এবং সে-গুলিতে যে আবর্জ্জনা জমে তাহা বহিয়া আনিবার কাজ উপশিরার রক্তই করে।

সহরের আবর্জ্জনা জলের সহিত মিশিয়া রাস্তার পাশের নর্দ্দামা দিয়া দূরে গিয়া পড়ে। উপশিরাগুলি সর্ব্বশরীর হইতে যে আবর্জ্জনা সংগ্রহ করে, তাহা কোথায় যায়, এখন সেই কথা তোমাদিগকে বলিব। যে-সকল ধমনী দিয়া হৃদ্‌পিণ্ডের রক্তসকল শরীরে ছড়াইয়া পড়ে, তাহার কয়েকটি প্রাণীদের পেটের ভিতরে এবং অন্ত্রে গিয়া পৌঁছায় এবং অসংখ্য উপশিরা দিয়া সেগুলির রক্ত ঐ-সকল যন্ত্রের সব জায়গায় ছড়াইয়া পড়ে। তাহার পরে ঐ-সকল উপশিরার রক্ত প্রাণীদের অন্ত্রের হজম-করা খাদ্যের সার জিনিস সংগ্রহ করিয়া তাহা কাছের শিরা দিয়া যকৃতে লইয়া গিয়া হাজির করে। যকৃৎ যন্ত্রটি শরীরের বড় উপকারী। শিরার রক্তে

যে-সব আবর্জ্জনা থাকে, তাহার কতক যকৃৎই নষ্ট করিয়া রক্তকে পরিষ্কার করে। আবর্জ্জনাগুলি হইয়া দাঁড়ায় তখন পিত্ত-রস। তা'র পরে সেই রক্তই খাবার বোঝাই লইয়া শিরা দিয়া হৃদ্‌পিণ্ডে হাজির হয়!

এখানে আমরা কেবল একরকম ধমনীর কাজের কথা বলিলাম। এই প্রকারে অন্য ধমনীও শরীরের নানা স্থানে গিয়া নানা প্রকার কাজ করে। এসম্বন্ধে তোমাদিগকে বেশি কিছু বলিব না। তোমরা বড় হইয়া শরীর-তত্ত্বের বই পড়িলে সব খবর জানিতে পারিবে। তোমরা কেবল এই কথা জানিয়া রাখ যে, রক্তের এক স্রোত হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়া ধমনীর ভিতর দিয়া চলে এবং পরে সেই রক্ত দূষিত হইয়া আর এক স্রোতের আকারে শিরার ভিতর দিয়া হৃদ্‌পিণ্ডে গিয়া হাজির হয়। তা'র পরে সেই বদ্ রক্ত ফুস্‌ফুসে নির্ম্মল হইলে তাহা আবার হৃদ্‌পিণ্ড হইতে বাহির হইয়া ধমনীর ভিতর দিয়া চলিতে থাকে। রক্তের এই রকম আনাগোনা দিবারাত্রিই প্রাণীর শরীরের ভিতর দিয়া চলে।

প্রাণীর শরীরের রক্ত-চলাচলে বিবরণ দিতে গিয়া অনেক কথা বলা হইল। এখন মাছদের শরীরে রক্তচলাচলের কথা বলিব। মাছদের হৃদ্‌পিণ্ডের বামে ও দক্ষিণে দুইটি কুঠারি থাকে। যে-রক্ত সকল শরীরের ভিতর দিয়া আসিয়া দূষিত হইয়াছে, তাহা এক কুঠারিতে গিয়া হাজির হয়।

তা'র পরে সেখান হইতে দ্বিতীয় কুঠারিতে পেঁীছিলে তাহা হৃদ্‌যন্ত্রের চাপে কান্‌কোর ভিতর দিয়া চলিয়া জলে-মিশানো বাতাসে নির্ম্মল হইয়া যায়। এই নির্ম্মল রক্তই সমস্ত দেহ ঘুরিয়া আবার দূষিত হইয়া প্রথম কুঠারিতে গিয়া হাজির হয়। মাছের শরীরের ভিতরে রক্তের এই রকম চলা-ফেরা অবিরাম চলে।

রক্ত জিনিষটা কি?

ছুরিতে আঙুল কাটিলে তোমাদের শরীর হইতে যে রক্ত বাহির হয়, তাহার আগাগোড়াই কেমন সুন্দর লাল দেখায়। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ফেলিয়া দেখিলে সেই রক্তেরই আর এক চেহারা দেখা যায়। তখন তোমরা বুঝিতে পারিবে যে পাত্‌লা জিনিষটাকে আমরা রক্ত বলি, তাহা জলের মতো বর্ণহীন। এই জিনিষটার উপরে যে অসংখ্য লাল কণা ভাসিয়া বেড়ায়, তাহাই রক্তকে লাল করে। রক্তের এই তরল জিনিষটাকে রক্তরস (Plasma) বলা হয় এবং খুব ছোটো লাল কণাগুলিকে নাম দেওয়া হয় লোহিত কণিকা (Red Corpuscles)। কিন্তু কেবল এই দুইটি জিনিস লইয়াই রক্ত নয়। ভালো করিয়া অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করিলে লোহিত কণিকার মাঝে এক রকম সাদা কণিকাকেও ভাসিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। রক্তে এই শ্বেত কণিকা (White Corpuscles) খুব বেশি থাকে না; পাঁচ শত বা সাত শত

লোহিত কণিকার মধ্যে একটি মাত্র শ্বেত কণিকা দেখা যায়।

লোহিত কণিকা ও শ্বেত কণিকা রক্তে থাকিয়া যে কাজ করে তাহা বড় আশ্চর্য্য। লোহিত কণিকাগুলি রক্তের স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া বেড়ায়, কিন্তু শ্বেত কণিকাগুলি তাহা করে না। ছোটো ছোটো পোকা পচা জলের ভিতরে কি-রকম চলা-ফেরা করে, তাহা তোমরা নিশ্চয় দেখিয়াছ। রক্তের শ্বেত কণিকাগুলি ঠিক জলের পোকাদেই মতো কখনো স্রোতের উল্‌টা দিকে, কখনো-বা স্রোতের আড়াআড়ি-ভাবে ভাসিয়া বেড়ায়। কেবল ইহাই নয়, আমিবা প্রভৃতি এক-কোষ প্রাণী যেমন নিজের দেহের আকৃতি বদ্‌লায়, রক্তের শ্বেত কণিকাগুলিও সেই-রকমে ইচ্ছামত চেহারা পরিবর্ত্তন করে। যে কণিকাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তোমরা এখন গোলাকার দেখিতেছ; একটু পরেই হয় ত তাহাকে চেপ্‌টা বা লম্বা হইতে দেখিবে। শ্বেত কণিকাগুলি উপশিরার গা ভেদ করিয়া ভিতরে যাইতেছে। এবং একটু পরেই আবার বাইরে আসিতেছে, ইহাও কখনো কখনো দেখা যায়। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, একবিন্দু রক্ত পাইলেই তোমরা তাহার শ্বেত ও লোহিত কণিকাগুলি দেখিয়া লইবে। কিন্তু তাহা পারিবে না। খুব বড় অণুবীক্ষণ ছাড়া এগুলিকে দেখা যায় না। ইহারা এত ছোটো জিনিষ যে, এক ইঞ্চি লম্বা এবং এক ইঞ্চি চওড়া এই জায়গাটুকুতে প্রায় এক কোটী কণিকা

অনায়াসে পাশাপাশি থাকিতে পারে। ভাবিয়া দেখ, সে-গুলি কত ছোটো!

রক্তে যে তিনটি জিনিস আছে, তাহাদের কথা তোমরা শুনিলে। এখন সেগুলি প্রাণীর শরীরে থাকিয়া কি কাজ করে, তাহা তোমাদিগকে বলিব।

জলের মতো স্বচ্ছ যে রক্তরসের কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি, তাহা রক্তকে পাত্‌লা রাখে। রক্ত পাত্‌লা থাকা খুবই দরকার। ইহা যদি কাদার মতো বা ইটের মতো জিনিষ হইত তাহা হইলে চুলের চেয়েও সরু সেই উপশিরার ভিতর দিয়া তাহা চলিতেই পারিত না। রক্তরসই খাদ্য সংগ্রহ করিয়া শরীরের কোষে কোষে দিয়া আসে। আবার শরীরের নানা জায়গায় যে অঙ্গারক বাষ্প ইত্যাদি আবর্জ্জনা জমে, তাহাও এই রক্তরসই বহিয়া লইয়া শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। আমাদের বড় বড় সহরের ময়লা-মাটি দূর করিবার জন্য ময়লা-ফেলা গাড়ী থাকে এবং খাবার বহিয়া আনিবার জন্য মালগাড়ি থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, প্রাণীদের শরীরের ভিতরে রক্তরসই ময়লা-ফেলা গাড়ি এবং মালগাড়ির কাজ করে।

রক্তের লোহিত কণিকাগুলিও কম দরকারি জিনিস নয়। অক্সিজেন্, প্রাণীদের শরীরের পক্ষে কত দরকারি তাহা আগে বলিয়াছি। কাঠে, কয়লায়, তেলে যে শক্তি লুকানো থাকে, হঠাৎ তাহা আমাদের নজরে পড়ে না। এই-সব জিনিস

যখন বাতাসের অক্সিজেনের সহিত মিলিয়া পুড়িতে থাকে, তখন তাপ, আলো ইত্যাদি কত ব্যাপারই আমাদের নজরে পড়ে। প্রাণীদের উঠা-বসা, নড়া-চড়া সকল ব্যাপারেই শক্তির দরকার। প্রাণীদের হজম-করা খাদ্যে, পেশীতে, স্নায়ুতে এবং গ্রন্থিতে অনেক শক্তি লুকানো থাকে। অক্সি-জেন্‌ই শরীরের ঐসব জায়গায় গিয়া সেই লুকানো শক্তি প্রকাশ করে এবং তাহাতে প্রাণীরা চলা-ফেরা করিয়া জীবনের কাজ দেখাইতে পারে। তাহা হইলে দেখ, প্রাণীদের শরীরের সব জায়গাতেই সর্ব্বদাই অক্সিজেন্‌ দরকার হয়। অক্সিজেন্‌ না হইলে যেমন আগুন জ্বলে না, তাপ পাওয়া যায় না, সেই-রকম অক্সিজেন্‌ না হইলে প্রাণীদের জীবনের কাজ এক মিনিটের জন্যও চলে না। রক্তে যে লোহিত কণাগুলি ভাসিয়া বেড়ায়, সেগুলিই শ্বাসযন্ত্র হইতে অক্সিজেন্‌ বোঝাই লইয়া যেখানে যে-রকম দরকার সেখানে সে-রকম অক্সিজেন্‌ জোগাইতে থাকে। তাহা হইলে দেখ, কাঠ, কয়লা প্রভৃতি বোঝাই লইয়া ষ্টীমার ও নৌকাগুলি যেমন নদীর ধারের বন্দরে-বন্দরে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং সেগুলির মধ্যে যেখানে যাহা দরকার সেখানে তাহা জোগাইয়া আসে, রক্তের লোহিত কণাগুলি কতকটা যেন সেই কাজই করে। তাই, রক্তে লোহিত কণা কম হইলে প্রাণীরা অসুস্থ হইয়া পড়ে, এবং মানুষের চোখ মুখ সাদা হইয়া যায়।

শ্বেত কণিকাগুলি রক্তে থাকিয়া যে কাজ করে, তাহার

কথা শুনিলে তোমাদের আরো আশ্চর্য্য লাগিবে। কুমীর যেমন জলের ছোটো মাছগুলিকে গিলিয়া ফেলে, সেই-রকমে শরীরে যে-সব রোগের জীবাণু থাকে, সেগুলিকে রক্তের শ্বেত কণিকাগুলি খাইয়া ফেলে। কেবল ইহাই নয়, শরীরের ভিতরে কোনো রকমে বিষ প্রয়োগ করিলে শ্বেত কণিকাগুলি তাহাকেও নষ্ট করে। তাহা হইলে দেখ, রক্তের শ্বেত কণিকাদের মতো প্রাণীদের আর কেহ নাই। পোষা কুকুর যেমন রাত্রিকালে তোমাদের বাড়ীতে পাহারা দেয় এবং চোর আসিলে যেমন ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কামড়াইয়া ধরে, শ্বেত কণিকাগুলি যেন শরীরের সেই-রকম পাহারাওয়ালা। কোথায় কি হইতেছে দেখিবার জন্য সেগুলি রক্তের স্রোতে ভাসিয়া শরীরের গলিতে ঘুঁচিতে প্রবেশ করে এবং যেখানে অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে সেখানে গিয়া অনিষ্ট থামাইয়া দেয়। মজার ব্যাপার নয় কি ?

রক্তের শ্বেত কণিকাগুলি কি-ভাবে প্রাণীদের উপকার করে, একটা উদাহরণ দিলে বোধ করি তোমরা তাহা ভালো বুঝিবে। মনে কর, খেলা করিতে গিয়া তোমার হাতে একটু বেশি রকম আঘাত লাগিল। এ-রকম আঘাতে কি হয়, তোমরা তাহা দেখ নাই কি ? আঘাত-লাগার জায়গাটা ফুলিয়া উঠে। ফোলা ব্যাপারটা যে কি তাহাও বোধ হয় তোমরা জানো না। মনে কর, তোমরা যেন একটি রবারের নলের মাঝখানটিকে টিপিয়া ধরিয়া তাহার ভিতরে জোরে

জল পম্প্ করিতেছ। এই অবস্থায় নলটির অবস্থা কি হইবে তোমরা তাহা ভাবিয়া দেখ। তখন রবারের নল জলের চাপে ফুলিয়া উঠিবে না কি ? উপশিরা বা শিরাতে আঘাত দিলে সেগুলির দশাও ঠিক রবারের নলের মতো হয়। রক্তের স্রোত ঐ-সকল্ শিরা-উপশিরার ভিতরে আসিয়া বাহির হইবার পথ পায় না। কাজেই, তখন তাহা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া সেগুলিকে ফুলাইয়া তোলে।

যাহা হউক, শরীরের কোনো জায়গা কোনো কারণে ঐ-রকম ফুলিয়া উঠিলেই রক্তের শ্বেত কণিকাগুলি তাহা জানিতে পারে এবং তাহারা দলে দলে ছুটিয়া আসিয়া সেখানে হাজির হয়। কিন্তু হাজির হইয়া তাহাদের একটিও চুপ করিয়া থাকে না, তাহারা আঘাত-লাগা জায়গাটাকে সারাইয়া এবং সেখানকার বদ্ধ রক্ত- টুকুকে খাইয়া ফেলিয়া কমাইয়া দেয়। যদি রোগের জীবাণু সেখানে জমা হইয়া থাকে, তবে শ্বেত কণিকাগুলির কাজ বাড়িয়া যায়। তখন জীবাণুদের সঙ্গে তাহাদের ভয়ানক লড়াই সুরু হয়। জীবাণুরা যদি শ্বেত কণিকাদের তুলনায় সংখ্যায় কম হয়, তবে শ্বেত কণিকাগুলি জীবাণুদিগকে খাইয়াই শেষ করে। কিন্তু জীবাণুর দল সংখ্যায় বেশি হইলেই বিপদ হয়। তখন জীবাণুরাই শ্বেত কণিকাগুলিকে মারিতে আরম্ভ করে। শরীরের ফোলা জায়গায় যে পূঁজ হয়, তাহা মরা শ্বেত কণিকাদেরই দেহ।

প্রাণীদের শরীরের ভিতরে, তলায় তলায় যে কত মারামারি এবং কত কাটাকাটি হইতেছে, তাহা তোমরা একবার ভাবিয়া দেখ।

মাছের রক্ত

মাছের রক্তের কথা বলিবার আগে রক্ত-সম্বন্ধে অনেক কথা তোমাদিগকে বলিলাম। এগুলি জানিয়া রাখা ভালো।

যাহা হউক মাছের রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহাতে লোহিত কণা এবং শ্বেত কণা দুই-ই আছে। কিন্তু অন্য প্রাণীর রক্তে যত বেশী থাকে, মাছের রক্তে তত বেশি থাকে না। এগুলির আকারও যেন কিছু বড়। পাখীর রক্তেই সকলের চেয়ে বেশি কণিকা দেখা যায়। মাছের রক্তের কণিকাগুলির আকৃতিও অন্য রকমের। এখানে মাছের রক্ত-কণিকার একটা ছবি দিলাম। দেখ, এগুলি কতকটা চেপ্‌টা ধরণের ;—আকৃতি যেন ডিমের মতো। পাখী ও ব্যাঙের রক্তের কণিকাও কতকটা এই রকমের।
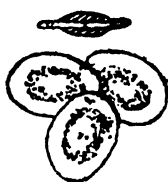
মাছের রক্ত-কণিকা

তাহা হইলে দেখ, কোনো প্রাণীর রক্ত যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করা যায়, তবে তাহা কোন্ প্রাণীর রক্ত, মোটামুটি

বলিয়া দিতে পারা যায়। কোনো জায়গায় খুনাখুনি হইলে সেখানে যে রক্ত থাকে, তাহা আজকাল পরীক্ষা করা হয় এবং তাহা মানুষের রক্ত কি অন্য প্রাণীর রক্ত ইহাতে জানা যায়।

জ্যান্ত মাছের গায়ে তোমরা হাত দিয়া দেখিয়াছ কি ? পাখী বা অন্য জানোয়ারের গায়ে হাত দিলে যেমন গরম বোধ হয়, মাছের গায়ে হাত দিলে সে-রকম বোধ হয় না। যে-জলাশয়ে মাছেরা বাস করে, তাহার জল যে-রকম ঠাণ্ডা, মাছদের রক্তও প্রায় ততটা ঠাণ্ডা দেখা যায়। এই জন্যই মাছদের শরীর ঠাণ্ডা।

প্রাণীদের গায়ের রক্ত কি-রকমে গরম হয়, তোমরা বোধ হয় তাহা জানো না। আমি আগেই বলিয়াছি, বাতাসের অক্সিজেন্ যখন কোনো জিনিসের সঙ্গে মিশিতে থাকে, তখন তাহাতে তাপ প্রভৃতি শক্তি প্রকাশ পায়। প্রাণীর রক্তকণিকা যখন অক্সিজেন্ বহিয়া শরীরের কোষে মিশায় তখন তাহাতে তাপ জন্মায়। এই তাপই আমাদের শরীরের তাপ। মরা প্রাণীর দেহে এই-রকমে অক্সিজেন্ প্রবেশ করে না, তাই তাহাদের শরীরে তাপ পাওয়া যায় না। মাছেরা কান্‌কোর রক্ত-কণিকা দিয়া অতি অল্পই অক্সিজেন্ টানিয়া লয়। কাজেই এই অক্সিজেন, মাছের শরীরের কোষে বা পেশীতে পৌঁছিয়া বেশি তাপ উৎপন্ন করিতে পারে না। এই জন্যই মাছদের শরীর গরম নয়।

মাছদের ইন্দ্রিয়

চোখ, কান, নাক, জিভ ইত্যাদির নাম ইন্দ্রিয়। চোখ আছে বলিয়াই বড় বড় প্রাণীরা দেখিতে পায়, কান আছে বলিয়া শুনিতে পায়, নাক আজে বলিয়া গন্ধ পায় এবং জিভ আছে বলিয়া স্বাদ পায়। ইন্দ্রিয় দিয়াই প্রাণীরা বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করে। ইন্দ্রিয় না থাকিলে প্রাণীরা মাটি বা পাথরের মতো অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকিত।

মাছদের দুইটা বড় বড় চোখ আছে। ইহা দিয়া তাহারা জলের ভিতরকার জিনিস স্পষ্ট দেখিতে পায়। কিন্তু জলের উপরে উঠিলেই তাহারা আর কিছুই দেখিতে পায় না। মাছদের চোখ জলের ভিতরে থাকিয়া দেখিবার জন্যই ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের যেমন চোখের পাতা আছে, মাছদের তাহা নাই। তাই তাহারা চোখের পলক ফেলিতে পারে না এবং চোখ বুজিতেও পারে না। পাছে চোখে কাটাকুটা পড়ে বা চোখের উপরকার জল শুকাইয়া যায়, এই জন্যই আমাদের চোখে পাতা থাকে। জলের তলায় মাছদের চোখে, কাটাকুটা পড়িবার সম্ভাবনা অল্প, তা' ছাড়া, উহা সর্ব্বদাই জলে, ভিজিয়া থাকে। কাজেই মাছদের চোখের পাতার দরকারই হয় না। তাহা হইলে দেখ, মাছেরা জলের তলায় চোখ মেলিয়াই ঘুমায়। বড মজার ব্যাপার নয় কি? মাছদের চোখের মণি কত

বড় তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। আমরা ডাঙায় যত আলো পাই, জলের ভিতরে তত আলো থাকে না। তাই জলের ভিতরে ভালো করিয়া দেখার জন্যই উহাদের চোখের মণিগুলি এত বড়। জলের তলায় এক হাত তফাতে যে-সব জিনিস থাকে, সেগুলিকে মাছেরা খুব ভালো দেখিতে পায়। দূরের জিনিস উহারা কষ্ট করিয়া দেখে।

তোমরা যদি একটা বড় রুই মাছের মাথা তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা কর, তাহা হইলে কোনো জায়গাতেই তাহার কানের খোঁজ পাইবে না। মাছদের কানের ছিদ্র নাই,—কান থাকে ইহার মাথার ভিতরে লুকানো। বাহিরের শব্দ মাথার হাড়গুলিকে কাঁপাইয়া ভিতরের সেই লুকানো কানে গিয়া পৌঁছায়। এই-রকমে তাহারা শব্দ শুনিতে পায়। মাছদের কানের ভিতরে কয়েক টুক্‌রা পাথরের মতো জিনিস থাকে। এগুলিকে কর্ণশিলা (Statolith) বলা হয়। মোটা কই মাছের মাথার ভিতরে এই-রকম বড় বড় পাথর পাওয়া যায়। এগুলি মাছদের কি কাজ করে, তাহা ঠিক্ জানা যায় নাই। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, মাছদের কান হইতে ঐ পাথরগুলি বাহির করিলে তাহারা সোজাসুজি সাঁতার না কাটিয়া যেন টলিতে টলিতে চলে। ইহা দেখিয়া মনে হয়, মাথায় কর্ণশিলা আছে বলিয়াই মাছেরা নিজেদের দেহকে খাড়া রাখিয়া জলের মধ্যে সাঁতার দিতে পারে!

মাছদের নাকের ছিদ্র তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। প্রায় সকল মাছেরই চোখের কাছে দুইটি করিয়া নাকের ছিদ্র দেখা যায়। অনেক জানোয়ারের নাকের ছিদ্রের সঙ্গে মুখের যোগ থাকে। তাই তাহারা নাক দিয়া গন্ধ-শোঁকা ও নিশ্বাস লওয়া এই দুই কাজই চালায়। কিন্তু মাছদের নাকের সঙ্গে মুখের একটুও যোগ নাই। ইহারা নাক দিয়া নিশ্বাস লয় না; কেবল গন্ধ শোঁকার কাজটাই নাক দিয়া চলে। ডাঙার জিনিসের গন্ধ যেমন বাতাসের সঙ্গে আসিয়া প্রাণীদের নাকে আসিয়া পৌঁছে, জলের ভিতরকার গন্ধ তেমনি জলের সঙ্গে মিশিয়া নাকের ছিদ্র দিয়া মাথার ভিতরকার যন্ত্রে হাজির হয়।

আমরা গণ্ডায় গণ্ডায় রসগোল্লা খাইতেছি, অথচ তাহার সেই মিষ্ট স্বাদ পাইতেছি না, যদি এ-রকমটি ঘটিত তাহা হইলে কি মুস্কিলই হইত! তখন রসগোল্লা খাওয়া এবং কুইনিনের বড় বড় বড়ি খাওয়া আমাদের কাছে একই ব্যাপার হইত না কি? তখন কাঁচা আম, পাকা কুল, পেয়ারা বা দালিম কোনো জিনিসেরই আমরা স্বাদ বুঝিতে পারিতাম না। এই অবস্থায় পাকা আমের রস এবং ক্যাষ্টর অয়েল মুখে দিলে একই রকম লাগিত। জিভই প্রাণীদের স্বাদ লইবার যন্ত্র। সম্মুখে আয়না রাখিয়া তোমার জিভ পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, তাহার উপরে ফুসুকুড়ির মতো অনেক গুঁটি গুঁটি দানা আছে। খাবার জিনিষ এ-গুলিতে

ঠেকিলেই, আমরা স্বাদ পাই। কেবল ইহাই নয়, মিষ্ট জিনিসের স্বাদ আমরা জিভের ডগা দিয়া জানিতে পারি; নোন্‌তা এবং টকের স্বাদ জিভের দুই ধার দিয়া বুঝিতে পারি এবং তিত জিনিসের স্বাদ জিভের তলা দিয়া বোধ করিতে পারি। তাহা হইলে দেখ, তোমরা যদি জিভের ডগায় কুইনিন্ ঘসিয়া দাও, তবে উহা তিত লাগিবে না; আবার জিভের তলায় চিনি ঘসিয়া দিলে, তাহা মিষ্ট বলিয়া বোধ হইবে না। মানুষ বড় বুদ্ধিমান, তাই নানা পরীক্ষা করিয়া তাহারা এই সব জানিয়া লইয়াছে। কিন্তু মাছদের জিভ নাই, তাই তাহারা খাবারের জিনিসের স্বাদ পায় কিনা ঠিক্ জানা যায় নাই। উহাদের মুখের যে-সব জায়গা হইতে শ্লেষ্মার মতো ঘন লালা বাহির হয়, বোধ করি সেই সব জায়গাই জিভের কাজ করে। কিন্তু যখন স্বাদ লইবার জন্য জিভ নাই তখন তাহারা নিশ্চয়ই আমাদের মতো ভালো মন্দ জিনিসের স্বাদ বুঝিতে পারে না। তাহা হইলে দেখ, মাছদের কি কষ্ট। মিষ্টি, টক্ কোনো জিনিসেরই তাহার স্বাদ পায় না। কেবল কতকগুলা জিনিস হাঁউমাঁউ করিয়া গিলিয়া পেট ভরায়।

আমাদের গায়ে কেহ হাত দিলে আমরা তাহা চট্ করিয়া জানিতে পারি; জিনিসটা গরম কি ঠাণ্ডা তাহাও আমরা হাতে ছুঁইয়া বা গায়ে ঠেকাইয়া বুঝিয়া লই। এই স্পর্শ-জ্ঞান প্রাণীদের বিশেষ দরকার। মনে কর, কোনো শত্রু

আসিয়া কোনো প্রাণীকে কামড়াইয়া দিল। এখন শত্রুর ছোঁয়াচ্ যদি সে বুঝিতে না পারে, তাহাকে তাড়াইবে কি করিয়া? তাই ছোঁয়াচ্ বুঝিবার জন্য প্রায় সকল প্রাণীরই ইন্দ্রিয় থাকে। গায়ের চামড়া ও জিভই এই ইন্দ্রিয়। কিন্তু অনেক মাছেরই গা আঁশে ঢাকা থাকে, কাজেই গা দিয়া ইহারা স্পর্শ বুঝিতে পারে না। মাছেরা কি করিয়া স্পর্শের কাজ চালায়, তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। বোয়াল, মাগুর, জিয়ল এবং তপ্‌সি মাছের মুখে যে লম্বা লম্বা গোঁফ থাকে, তাহা দিয়াই উহাদের ছোঁয়ার কাজ চলে। কাত্‌লা, রুই প্রভৃতি অনেক মাছেরই গায়ের দুই পাশে আঁশের উপরে দুইটা দাগ আছে। ইহা তোমরা দেখ নাই কি? ইহাকে জেলেরা সেলাইয়ের দাগ (Lateral lines) বলে। ছুঁচ দিয়া কাঁথা সেলাই করিলে যেমন এক-একটা শেলাইয়ের দাগ হয়, এগুলি যেন সেই রকমেরই। আমরা আগে যে রুই মাছের ছবি দিয়াছি, তোমরা তাহাতে শেলাইয়ের দাগ দেখিতে পাইবে। মাছেরা এই দাগ দিয়াও স্পর্শ বুঝিয়া লয়।

প্রাণীদের যদি সন্তান না হয়, তবে তাহাদের বংশ লোপ পায়। মনে কর, পৃথিবীতে যত ছাগল আছে তাহাদের কোনোটিরও যেন বাচ্চা হইল না। এখনকার সব বাচ্চা ও ধাড়ি ছাগলগুলা সাত বা আট বৎসরের মধ্যে মরিয়া গেলে, তোমরা পৃথিবীতে কি আর ছাগল দেখিতে পাইবে? তখন সমস্ত

পৃথিবী খুঁজিয়া একটাও ছাগল পাইবে না। তাহা হইলে দেখ, বংশরক্ষার জন্য সন্তান হওয়া খুব দরকার। অন্য প্রাণীদের মতো মাছেরা সন্তান দ্বারা বংশ রক্ষা করে। কি করিয়া ইহাদের সন্তান হয়, তাহাই তোমাদিগকে বলিব।

গাছে ফুল ধরে; তা'র পরে সেই ফুল হইতে ফল হয় এবং তাহাতে বীজ হয়। শেষে সেই বীজ পাকিয়া মাটিতে পড়িলে নূতন গাছের জন্ম হয়। ইহা তোমরা সকলেই জানো। কিন্তু ফুল হইলেই যে তাহাতে ফল ধরে, ইহা ঠিক্ কথা নয়। তোমরা লাউ-কুমড়া প্রভৃতি গাছের ফুল দেখ নাই কি? সেগুলিতে অনেক ফুল ধরে, কিন্তু সব ফুলে ফল হয় না। যে-সব ফুলের গোড়ায় ফলের জালি থাকে, কেবল সেগুলি হইতেই ফল হয়। এই রকম ফুলকে মাতৃফুল বলে। আর যে-সব ফুলের তলায় জালি থাকে না এবং ফুটিয়াই শুকাইয়া যায়, তাহাদিগকে বলা হয় পিতৃফুল। তোমাদের বাগানে যখন লাউ, কুমড়া, ঝিঙে, ধেঁধল বা তরমুজের গাছে ফুল ধরিবে, তখন ফুলগুলি পরীক্ষা করিয়ো। তাহা হইলে আমরা কাহাকে পিতৃফুল এবং কাহাকেই-বা মাতৃফুল বলিতেছি তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, গাছে মাতৃফুল ধরিলেই তাহা হইতে বুঝি ফল হয়। কিন্তু তাহা নয়। ফল ধরিবার জন্য পিতৃফুল ও মাতৃফুল দুইয়েরই দরকার। ফুলের পরাগ তোমরা বোধ করি দেখিয়াছ। কেয়া ফুলে ধূলার মতো অনেক পরাগ

থাকে। লেবু, পেয়ারা, দাড়িম, গোলাপ,—সব ফুলেই এই রকম পরাগ আছে। লাউ, কুমড়া প্রভৃতি যে-সব গাছের নাম বলিলাম, তাহাদের পিতৃফুলে পরাগ থাকে; কিন্তু মাতৃফুলে পরাগ থাকে না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহাদের পিতৃফুলের পরাগ মাতৃফুলে না ঠেকিলে কোনো রকমেই মাতৃফুলে ফল ধরে না। মনে কর, তোমাদের বাগানের কুমড়া গাছে একটাও পিতৃফুল নাই,—তাহাতে কেবল মাতৃফুলই ফুটিয়াছে। তাহা হইলে দেখিবে, সেই-সকল মাতৃফুলের গোড়ার জালি শুকাইয়া বা পচিয়া যাইতেছে। ইহা হইতে বোধ হয় তোমরা বুঝিতেছ, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি গাছে ফুল হইতে ফল ধরিতে মাতৃফুল ও পিতৃফুল দুইয়েরই দরকার হয়। অধিকাংশ প্রাণীর মধ্যেও ঠিক ইহাই দেখা যায়। পিতা ও মাতা না থাকিলে সন্তান হয় না। গাছপালার সঙ্গে প্রাণীদের কত মিল আছে, তাহা বুঝাইবার জন্যই তোমাদিগকে এত কথা বলিলাম।

কি-রকমে মাছদের সন্তান হয়, এখন তাহা বলা যাউক। গরু, ঘোড়া, ছাগল ইত্যাদির মধ্যে কতক স্ত্রী এবং কতক পুরুষ হইয়া জন্মে, মাছদের মধ্যেও তাহাই দেখা যায়। তোমাদের পুষ্করিণীর রুই-মাছগুলির মধ্যে নিশ্চয়ই কতক পুরুষ এবং কতক স্ত্রী মাছ আছে। ধাড়ি ছাগল ও গাই গরু বাচ্চা প্রসব করে। কিন্তু স্ত্রী-মাছেরা তাহা করে না। স্ত্রী-মাছের পেটে ডিম হয়। এই ডিম তাহারা জলেই প্রসব

করে। তা'র পরে কোথা হইতে একটা পুরুষ মাছ আসিয়া সেই ডিমগুলিতে তাহার শরীরের ভিতরকার একটা রস ছড়াইয়া দেয়। ইহার পরে, সাধারণতঃ স্ত্রী বা পুরুষ কোনো মাছই সেই সব ডিমের খোঁজ করে না। জলে ভাসিয়া থাকিয়া সেগুলি পুষ্ট হইতে থাকে। শেষে একদিন সেই সব ডিম হইতে ছোটো ছোটো বাচ্চা বাহির হয় এবং বাহির হইয়াই তাহারা জলে সাঁতার দিতে আরম্ভ করে।

তোমাদের ছাগলের বাচ্চা হইলে, সেগুলি অনেক দিন পর্য্যন্ত ঘাস খুঁটিয়া খাইতে পারে না। তখন তাহারা মায়ের দুধ খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে। ডিম হইতে বাহির হইয়া মাছের বাচ্চারা খাবার খুঁজিয়া খাইতে পারে না। বাচ্চাদের মা যে খাবার আনিয়া মুখে দিবে তাহারও উপায় থাকে না। ডিম পাড়ার পরে মাছদের মায়ের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। তাই ছোটো বাচ্চাগুলি যাহাতে কিছু না খাইয়া ক্ষুধায় মারা না যায়, তাহার জন্য একটি সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

এখানে একটা খুব ছোট বাচ্চা মাছের ছবি দিলাম। দেখ, মাছটির বুকের নীচে একটি ছোটো থলি রহিয়াছে। তোমরা বোধ হয় জানো, ডিমের ভিতরে যে হলদে জিনিষটা থাকে তাহা খুবই পুষ্টিকর। যে-সব প্রাণী ডিম হইতে

বাচ্চা মাছের বুকে খাবারের থলি

বাহির হয়, তাহাদের শরীর ঐ হল্‌দে জিনিসটা দিয়াই তৈয়ারী হয়।

ছবিতে মাছের গলায় যে থলিটা দেখিতেছ, তাহাতে ডিমেরই কিছু অংশ আছে। ঐ জিনিষটা শরীরে টানিয়া লইয়া মাছের বাচ্চারা কয়েকদিন অন্য কিছু না খাইয়াও বাঁচিয়া থাকে। তাহা হইলে দেখ, যখন গাড়ি বা নৌকাতে আমরা দূরে বেড়াইতে যাই, তখন আমরা যেমন খাবার সঙ্গে লইয়া বাহির হই, মাছেরা ডিম হইতে বাহির হইবার সময়ে ঠিক তাহাই করে। তাহাদের গলায়-ঝুলানো খাবার যখন ফুরাইয়া যায়, তখন তাহারা একটু বড়-সড় হয় এবং জলের ছোটো পোকা-মাকড় ধরিয়া খাইতে শিখে। ইহার পরে তাহাদের আর খাবারের ভাবনা ভাবিতে হয় না।

এক-একটা মাছের পেটে কত ডিম থাকে। তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। তোমরা গুণিয়া দেখিতে গেলে, গুণিয়াই শেষ করিতে পারিবে না। কোনো কোনো মাছের পেটে আট লক্ষ হইতে দশ লক্ষ পর্য্যন্ত ডিম পাওয়া যায়। মাঝারি রকমের রুই মাছের পেটে প্রায় ছয় লক্ষ ডিম থাকে। তিত্ পুঁটি কত ছোটো মাছ, তাহা তোমরা হয় ত দেখিয়াছ ; ইহাদের পেটে প্রায় দুই হাজার করিয়া ডিম পাওয়া যায়।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, সব ডিম হইতেই বুঝি বাচ্চা বাহির হয়। কিন্তু তাহা হয় না। মাছদের শত্রু অনেক।

পেট হইতে ডিম বাহির হইবামাত্র, অন্য মাছে এবং জলের অন্য জন্তুতে অনেক ডিমই খাইয়া ফেলে। কোনো কোনো মাছ আবার নিজেদের ডিম নিজেরাই খাইয়া ফেলে। এই রকমে নষ্ট হওয়ার পরে যেগুলি থাকে তাহা হইতে ক্রমে বাচ্চা বাহির হয়। কিন্তু এই বাচ্চারাও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। কিল্‌-বিল্‌ করিয়া বেড়াইতে দেখিলে অন্য মাছেরা কপ্‌কপ্‌ করিয়া তাহাদিগকে খাইয়া ফেলে। কাজেই শেষে দেখা যায়, অল্প বাচ্চাই বাঁচিয়া বড় হইয়াছে। মাছেরা যতগুলি ডিম ছাড়ে, সবগুলি হইতেই যদি বাচ্চা জন্মিত এবং তাহারা যদি বড় হইত, তাহা হইলে আমাদের নদী-সমুদ্র, খাল ও পুষ্করিণীগুলি কি অবস্থা হইত একবার ভাবিয়া দেখ। তখন সেগুলির জল মাছে-মাছেই ভরা থাকিত। তোমরা যে নদীতে নামিয়া স্নান করিবে, তাহার উপায় থাকিত না।

হাঁসের পেটে যেমন চৌদ্দ বা পনেরোটা ডিম হয়, মাছের পেটে তাহা না হইয়া কেন হাজার হাজার ডিম হয়, তোমরা বোধ হয় তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছ। যদি বুড় রুই মাছের পেটে কেবল পনেরোটা করিয়া ডিম হইত এবং সেই ডিম কয়েকটা যদি অন্য মাছে খাইয়া ফেলিত, তাহা হইলে এই মাছদের বংশ থাকিত কি! মাছেরা অনেক ডিম প্রসব করে বলিয়াই আপদে-বিপদে নষ্ট হওয়ার পরে কয়েকটি বাচ্চা কোনো গতিকে বাঁচিয়া থাকিয়া বড় হইতে পায় এবং তাহাতেই

মাছদের বংশ রক্ষা হয়। কেবল মাছদের মধ্যেই যে ইহা দেখা যায়, তাহা নয়। ছোট পোকা-মাকড়ের মধ্যেও দেখা যায়, যাহারা মরে বেশি, তাহারা জন্মেও বেশি।

পাখীরা ডিম প্রসব করিয়া, কয়েকদিন তা দিয়া সেগুলিকে গরমে রাখে। ইহাতে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। মাছেরা ডিমে তা দেয় না। ঠাণ্ডা জলে যাহাদের বাস, তাহারা আবার ডিমকে গরম রাখিবে কি করিয়া? তবুও শীঘ্র বাচ্চা বাহির হওয়ার জন্য মাছের ডিমেও একটু-আধটু গরম লাগা দরকার। রৌদ্রের তাপে নদ-পুষ্করিণীর উপরকার জল যে একটু গরম হয়, তাহাতেই ডিম ফুটিয়া যায়। ভালো রৌদ্র পাইলে দুই সপ্তাহের মধ্যেই অনেক মাছের ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হয়। ভালো তাপ না পাইলে কখনো কখনো সেই সব ডিম ফুটিতে একমাস পর্য্যন্ত সময় লয়।

আমরা পুকুরে বাচ্চা মাছ ছাড়িয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকি; সেগুলিকে অন্য মাছে বা অন্য প্রাণীতে খাইয়া ফেলিল কিনা সন্ধান রাখি না। আমেরিকার অনেক জায়গায় পশু ও পাখী পালনের মতো মাছও পালন করা হইতেছে। বড় বড় চৌবাচ্চায় মাছ ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের ডিমের যত্ন করা হইতেছে এবং সেই-সকল ডিম হইতে যে-সব বাচ্চা হইতেছে, সেগুলি যাহাতে মারা না যায়, তাহাও দেখা হইতেছে। তা'র পরে বাচ্চাগুলি বেশ বড় হইলে সেগুলিকে দেশের লোকে কিনিয়া নিজেদের পুকুরে ছাড়িয়া দিতেছে।

এই-রকমে মাছ পালন করায় মাছদের চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির অনেক নূতন খবর আমরা জানিতে পারিতেছি।

মাছের শরীরের হাড়

আমরা আগেই বলিয়াছি, শরীরে যাহাদের হাড় থাকে তাহারাই মেরুদণ্ডী প্রাণী। আবার হাড়ের মধ্যে মেরুদণ্ড অর্থাৎ শিরদাঁড়াই প্রধান হাড়। গায়ের মাংস খসিয়া গেলে কেবল হাড় লইয়া মাছের যে-রকম চেহারা হয়, এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম।
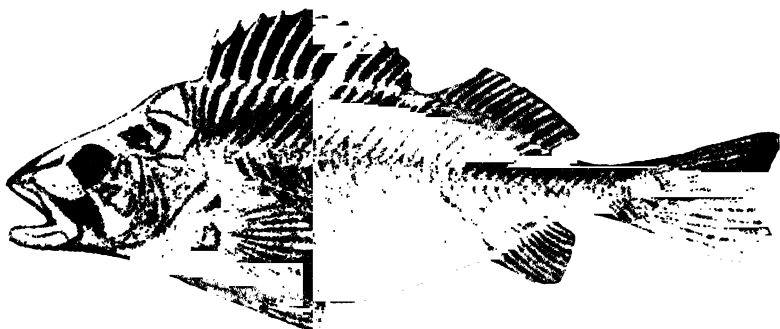
মাছের কঙ্কাল

তোমরা যদি মাছের ঠিক এই রকম কঙ্কাল দেখিতে চাও, তাহা হইলে তোমরা একটা পুঁটি বা বাচ্চা কই মাছকে পিঁপড়ের গাদায় ফেলিয়া রাখিয়ো। পিঁপড়েরা গায়ের মাংস খাইয়া ফেলিলে, তোমরা ছবিখানিরই মতো মাছটির হাড়গুলিকে সাজানো দেখিতে পাইবে।

ছবি দেখলেই মনে হয় যেন, মাছের দুইটি মেরুদণ্ড

আছে। কিন্তু তাহা ঠিক্ নয়। লেজ হইতে বাহির হইয়া যে হাড়গুলি পর-পর সাজানো আছে, উহাই মাছের মেরুদণ্ড। উপরের কাঁটাগুলি ডানার হাড়। আমাদের শরীরে যেমন পাঁজরার হাড় আছে মাছের শরীরেও তোমরা তাহা দেখিতে পাইবে। দেখ, ছবিতে পাঁজরার হাড় মেরুদণ্ডের সঙ্গে লাগানো আছে। চিতল প্রভৃতি মাছে অনেক কাঁটা থাকে। যাহারা মাছ খায়, তাহারা এই-সব মাছ পছন্দ করে না। মাছের এই-রকম ছোটো কাঁটা মেরুদণ্ডের সঙ্গে লাগানো থাকে না; পাঁজরার হাড়ের নীচে মাংসের মধ্যে সেগুলি গোঁজা থাকে। ইহাতে গায়ের থল্‌থলে মাংস শক্ত হয়। ছবিতে দেখ, মাছের পিঠে ডানার গোঁড়ার কাঁটাগুলি মেরুদণ্ডের গায়ে লাগানো নয়। এগুলি মাংসের ভিতরে পৃথক্ সাজানো থাকে।

এখানে মাছের পিঠে ডানার কাঁটাগুলির একটা ছবি দিলাম। দেখ, ডানার কাঁটাগুলির আগা ছুঁচলো এবং আগাগুলি চামড়া দিয়া ঢাকা নাই। এই-রকম শক্ত ও ছুঁচ্‌লো ডানা তোমরা কই প্রভৃতি মাছের পিঠে দেখিতে পাইবে। কিন্তু অধিকাংশ মাছেরই পিঠের ডানার কাঁটা এ-রকম শক্ত নয়। সেগুলি
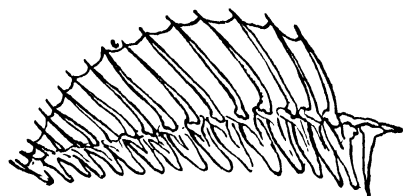
পিঠের ডানার কাঁটা

এক-রকম নরম হাড় দিয়া তৈয়ারী। রুই, কাত্‌লা প্রভৃতি অনেক মাছেরই পিঠে তোমরা নরম কাঁটা দেখিতে পাইবে। জিয়ল, মাগুর ইত্যাদি মাছের পিঠের ডানার কাঁটা এত নরম যে, তাহাতে হাড় নাই বলিয়াই যেন মনে হয়।

মাছদের মাথায় যে-সব ছোটো হাড় আছে, সেগুলি বড় জটিলভাবে সাজানো থাকে। তোমাদিগকে তাহার কথা এখন বলিব না। তোমরা পরে যখন প্রাণীবিদ্যার বড় বড় বই পড়িবে, তখন সেগুলির কথা জানিতে পারিবে।

মাছদের বর্গ-বিভাগ

এই পৃথিবীতে প্রায় তের হাজার উপজাতির (Species) মাছ আছে। এখন যদি সেই তের হাজার রকমের মাছের খবর তোমাদিগকে দিতে যাই, তাহা হইলে কি ভয়ানক ব্যাপারই হয় ভাবিয়া দেখ। তা'র পরে সেই মাছের সব-গুলিকে তোমরা বাংলা দেশে দেখিতেই পাইবে না। ইহাদের অনেকেই থাকে, দেশ-বিদেশের সমুদ্রের জলে। যে-সব মাছ আমাদের বাংলা দেশের নদী খাল ও পুষ্করিণীতে দেখা যায়, আমরা তাহাদেরি মধ্যে কয়েকটির কথা তোমাদিগকে বলিব।

পৃথিবীর সমস্ত মাছকে প্রথমে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। এক ভাগের নাম দৃঢ়াস্থি (Osseous) এবং আর এক ভাগের নাম কোমলাস্থি (Cartilaginous)। যে-সব মাছে শরীরের হাড় খুব শক্ত তাহাদিগকে বলে দৃঢ়াস্থি।

পৃথিবীতে দৃঢ়াস্থি মাছই বেশি। রুই, মৃগেল, পুঁটি, চিতল, বোয়াল প্রভৃতি সব মাছই দৃঢ়াস্থি দলের। যে-সব মাছের শক্ত হাড় নাই এবং খোঁজ করিলে যাহাদের শরীরে আমাদের কানের ও নাকের হাড়ের মতো নরম হাড় ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না, তাহাদিগেই বলে, কোমলাস্থি মাছ। এই জাতির মাছ, আমাদের খাল বিল বা পুকুরে পাওয়া যায় না। তা'রা থাকে সমুদ্রের জলে ; কখনো কখনো সমুদ্রের কাছে নদীতেও আসে। হাঙ্গর, করাত মাছ (Saw fish) প্রভৃতি কয়েকটি মাছকে লইয়াই এই জাতি হইয়াছে। তোমরা কখনো যদি কলিকাতার যাদুঘরে বেড়াইতে যাও, তবে করাত মাছ ও হাঙ্গরের আকৃতি দেখিয়া লইয়ো।

যাহা হউক, আমাদের দেশে যে-সব দৃঢ়াস্থি মাছ আছে, আগে তাহাদেরি একটু পরিচয় দিব। তা'র পরে কোমলাস্থি মাছদের কথা বলিব।

যে-সব পণ্ডিত জন্তু-জানোয়ার লইয়া নাড়াচাড়া করেন, তাঁহারা সমস্ত প্রাণীকে কি-রকমে গণ, শ্রেণী, বর্গ, গোষ্ঠী, জাতি এবং উপজাতি এই কয়েকটি দলে ভাগ করেন, তাহার কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। তাহা যদি বুঝিয়া থাক, তবে কোনো মাছের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেই তোমরা বলিতে পারিবে, উহার গণ—মেরুদণ্ডী ; শ্রেণী—মৎস্য। ইহার পরে বর্গ, গোষ্ঠী, জাতি এবং উপজাতি স্থির করিতে গেলে তাহার আকৃতি-প্রকৃতির খুঁটিনাটি অনেক সন্ধান

করিতে হয়। প্রাণিবিদ্যার পণ্ডিতরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন আমাদের ভারতবর্ষে ৪৩৭ জাতির মাছ আছে এবং তাহারি আবার মোট ১৬১৮ রকম উপজাতি রহিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই সমুদ্রে বাস করে এবং লোনা জল ভিন্ন বাঁচে না। আমাদের খাল বিল ও নদীতে ৭৯ জাতিতে কেবল ৩৬১ উপজাতির মাছ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে আবার কতকগুলি এক-এক সময়ে সমুদ্র ছাড়িয়া নদীতে আসে এবং সেখানে ডিম ছাড়িয়া আবার সমুদ্রে চলিয়া যায়।

ভারতবর্ষের মাছগুলিকে মোটামুটি পাঁচটি বর্গে ভাগ করা যায়। আমরা একে একে প্রত্যেক বর্গের মাছের একটু-একটু পরিচয় দিব।

প্রথম বর্গ

প্রথম বর্গের (Physostome) মাছদের মধ্যে অনেক গোষ্ঠীর (family) কথাই আমরা জানি। বান, মাগুর, জিয়ল, রুই, মৃগেল, কাত্‌লা, ইলিস ইত্যাদি অনেক মাছই এই বর্গের মধ্যে পড়ে। কই মাছের পিঠের ডানার কাঁটা-গুলির ডগা যেমন করাতের মতো, এই বর্গের মাছে তাহা দেখা যায় না। কেবল পেটের তলা এবং বুকের ডানার সম্মুখের একটা করিয়া কাঁটার ডগা একটু-একটু বাহির করা থাকে।

মাগুর, জিয়ল প্রভৃতি মাছ তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ।

ইহাদের বত্রিশটা জাতি এবং ১১৭টা উপজাতি আছে। তাহা হইলে দেখ, মাগুর, জিয়ল কত রকমেরই আছে। ইহারা লোনা জলে থাকতে চায় না, কাদা-গোলা ঘোলা জলই পছন্দ করে। এই গোষ্ঠীর (Seluridae) কাহারো গায়ে আঁশ থাকে না, কিন্তু প্রায় সকলেরি মুখে গোঁফের মতো শুঁয়ো থাকে। পিঠের এবং বুকের ডানার সম্মুখে একখানি করিয়া কাঁটা সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকে। এগুলি খুব শক্ত ও ছুঁচ্‌লো। কখনো কখনো তাহাতে বিষও থাকে। শত্রুরা ধরিতে আসিলে এই-সব মাছ ঐ কাঁটাগুলি শত্রুর গায়ে ফুটাইয়া আত্মরক্ষা করে। জিয়ল মাছে হাতে কাঁটা বিঁধাইলে হাত ফুলিয়া উঠে ও বড় বেদনা হয়। আড়্ মাছ তোমরা দেখ নাই কি? ইহাও মাগুর গোষ্ঠীর মাছ। ইহাদেরও ডানায় কাঁটা আছে। তা' ছাড়া
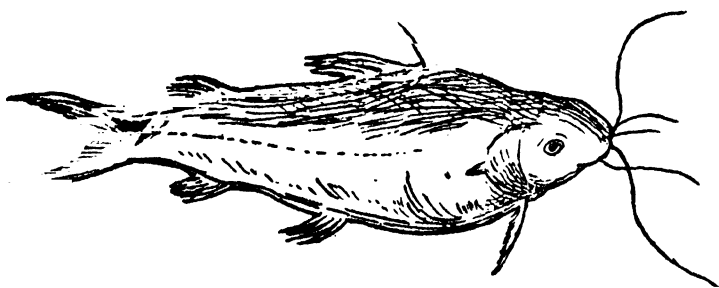
ট্যাংরা মাছ

ট্যাংরা, পাপ্‌দা, বোয়াল ও পাঙ্গাস্ মাছকেও এই দলে ফেলিতে পারা যায়।

রুই গোষ্ঠীর মাছ যে আমাদের দেশে কত আছে, তাহার

হিসাব করাই কঠিন। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ভারতবর্ষে রুই গোষ্ঠীতে ছত্রিশ জাতির মাছ আছে এবং এই-সকল জাতিতে ২৩০ রকমের উপজাতি আছে। ভাবিয়া দেখ, রুই গোষ্ঠী কত বড়? মৌরলা, বাটা, ভাঙ্গন, বাউস, কাত্‌লা, সরল পুঁটি, তিত পুঁটি প্রভৃতি অনেক মাছই এই গোষ্ঠীর মাঝে আছে। ইহারা লোনা জলে থাকিলে বাঁচে না। ইহাদের অনেকেরই গায়ে আঁশ আছে। বোয়াল মাছের মতো কাহারো মুখে দাঁত থাকে না; দাঁত থাকে তালুর মধ্যে। এই গোষ্ঠীর সকল মাছকেই লোকে ধরিয়া খায়। কিন্তু অনেকেরই শরীরে বেশি কাঁটা থাকে। রুই ও কাত্‌লা দক্ষিণ ভারতবর্ষে জন্মে না। এই গোষ্ঠীতে মহাশির নামে যে এক মাছ আছে, তাহা খুব বড় হয়। এক-একটার ওজন কখনো কখনো এক মণ পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। আমাদের দেশের পাহাড়ে নদীতে এই মাছ জন্মে।
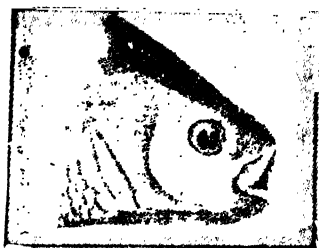
কাত্‌লা মাছ
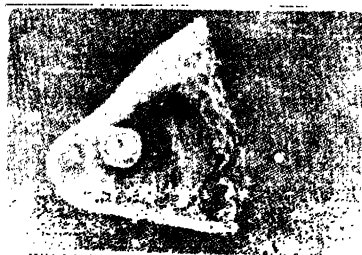
মৃগেল মাছ

ইলিস মাছকে তোমরা হয় ত রুই গোষ্ঠীর বলিয়া মনে
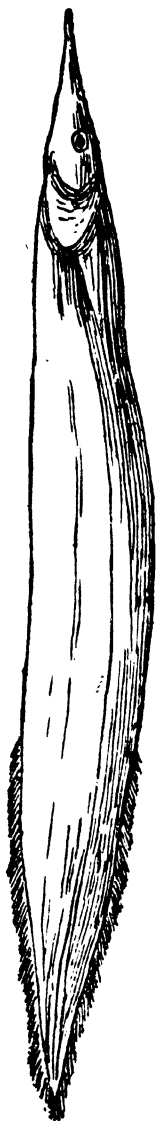
করিতেছে। কিন্তু তাহা নয়, ইলিসের গোষ্ঠী (Elupeidae) পৃথক্। ইহাদিগকে দক্ষিণ ভারত, সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশেও দেখা যায়। বর্ষাকালে নদীর জল বাড়িলেই ইহারা স্রোতের উল্‌টা দিকে দলে-দলে চলিতে আরম্ভ করে। এই-রকমে ইলিস মাছ পদ্মা হইতে দিল্লীর কাছ পর্য্যন্ত গিয়াছে শুনা যায়। ইলিস গোষ্ঠীর সকল মাছই এই-রকমে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় চলা-ফেরা করে। খয়রা ও ফ্যাঁসা মাছ এই গোষ্ঠীরই মধ্যে পড়ে।

প্রথম বর্গের জানাশুনা মাছগুলির কথা তোমাদিগকে বলিলাম। এগুলি ছাড়া পাখীর মতো লম্বা ঠোঁট্‌ওয়ালা কতকগুলি মাছও এই বর্গে আছে। পাঁকাল, কেঁক্‌লে ও বানেরা এই বর্গেরই মাছ। উড়ুক্কু

উড়ুক্কু মাছ

পাঁকাল মাছ

মাছ তোমরা দেখ নাই এগুলি সমুদ্রে

দলে-দলে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়। ইহাদের বুকের ডানা দুইটি খুব বড়, ঠিক্ যেন পাখীর ডানার মতো। জল হইতে শূন্যে লাফাইয়া ঐ ডানা নাড়িয়া উহারা দুই চারি হাত তফাতে উড়িয়াও যাইতে পারে। এইজন্যই ইহাদিগকে উড়ুক্কু মাছ বলা হয়। যাহা হউক, এই মাছেরাও প্রথম বর্গের অন্তর্গত।

দ্বিতীয় বর্গ

এই বর্গের (Acanthopterigy) অনেক মাছই সমুদ্রে বা সমুদ্রের ধারে খাল বা বিলের লোনা জলে দেখা যায়। এইজন্য আমরা এগুলিকে ভালো করিয়া জানি না। সমুদ্রের কাছের হাটে-বাজারে জেলেরা যখন এই বর্গের মাছ বিক্রয় করিতে আনে, তখন আমরা সেগুলির চেহারা দেখিতে পাই মাত্র। আমাদের জানাশুনা মাছের মধ্যে রুই, ভেট্‌কি, তপ্‌সি, কুঁচে প্রভৃতি এই বর্গে পড়ে। ইহাদের পিঠের ও পেটের তলার ডানাগুলির সব কাঁটা চামড়া দিয়া ঢাকা নয়। তাই ঐ ডানাগুলি কতকটা যেন করাতের মতো ধারালো।

ভেট্‌কি মাছ বোধ করি তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেখিয়াছ। এগুলি কখনো কখনো ওজনে দুই মণেরও বেশি হয়। তপ্‌সি মাছ লোনা জল ভিন্ন বাঁচে না। তাই সমুদ্র হইতে দূরের নদীতে ইহাদের দেখা যায় না। জোয়ারের সময়ে এগুলি উজাইয়া নদীতে উঠে। তপ্‌সি মাছ আকারে আধ হাতের বেশি হয়

না। এই ছোটো মাছের মাথার শুঁয়োগুলি কিন্তু ছোটো নয়। মাছ যতটা লম্বা শুঁয়োগুলিকে তাহার দ্বিগুণ বা তিনগুণ পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। ইহাদের শুঁয়োগুলি বুকের ডানার সঙ্গে লাগানো থাকে। বুকের ডানার কাঁটাই সরু হইয়া এই সব শুঁয়োর উৎপত্তি করে।

আমরা যাহাকে বান্ মাছ বলি, তাহা এই বর্গেরই আর একটি মাছ। ইহারা খাল, বিল ও পুকুরের অল্প জলে গর্ত্ত করিয়া বাস করে। বান্ মাছের পেটের তলাকার ডানায় বেশ বড় ও ছুঁচ্‌লো কাঁটা থাকে।

চ্যাঙ্, লেঠা, শোল মাছ নদী, বিল ও পুকুরে প্রায়ই দেখা যায়। ইহাদের অনেকেরই মুখ চেপ্‌টা—কতকটা সাপের মতো। বঁড়শিতে ব্যাঙ্ বা অন্য মাছ গাঁথিয়া ছিপ্ ফেলিলে ইহারা কপ্ করিয়া টোপ্ সমেত বঁড়শি গিলিয়া ফেলে। ইহাতে বঁড়শি মুখে আট্‌কাইলে তাহারা ধরা পড়িয়া যায়। ইহারা জল হইতে ভাল করিয়া বাতাস টানিতে পারে না। তাই মাঝে মাঝে জলের উপরে ভাসিয়া কান্‌কোতে বাতাস লাগায়। বাতাস না পাইলে এই-সব মাছ মারা যায়। এই জন্যই জল হইতে উঠাইয়া ডাঙায় রাখিলে ইহারা সহজে মরে না। গ্রীষ্ম-কালে বিলের জল শুকাইয়া মাটি ফাটিয়া গেলেও উহারা সেই সব গর্ত্তের ভিতর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে। তা'র পরে বর্ষার বৃষ্টির জলে যখন খাল বিল পূর্ণ হয়, তখন তাহারা সেই সব গর্ত্তের বাহিরে আসে।

কই মাছ তোমরা সকলে দেখিয়াছ। কান্‌কো দিয়া হাঁটিয়া ইহারা ডাঙায় চলা-ফেরা করিতে পারে। এখানে কই মাছের মাথার একটা ছবি দিলাম। মাথার ঐ কুঠারির মতো অংশে ইহারা জল পুরিয়া রাখিতে পারে। এই জলে উহাদের কান্‌কো-গুলি ভিজা থাকে। তা'র পরে সেই কান্‌কো
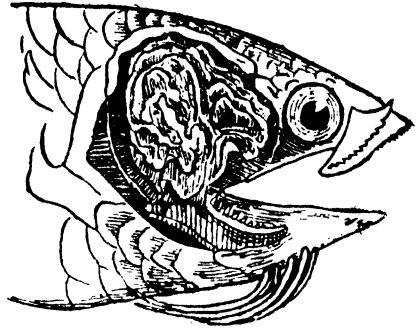
কই মাছের মাথা

দিয়া তাহারা ডাঙার বাতাস হইতে অক্সিজেন্ টানিয়া লয়। এইজন্যই ডাঙায় উঠিলে কই মাছ সহজে মরে না। ডাঙায় জাল পাতিয়া মাছ ধরার কথা তোমরা শুনিয়াছ কি? পূর্ব্ববঙ্গে নাকি এই রকমেই কই মাছ ধরা হয়। বৃষ্টির পরে যখন এই মাছ দলে দলে ডাঙায় বেড়াইতে আরম্ভ করে, লোকে ডাঙায় জাল পাতিয়া তখন সেগুলিকে ধরিয়া ফেলে।

তৃতীয় বর্গ

এই বর্গের (Anacantheri) মাছ আমাদের দেশে প্রায়ই নাই। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার নদীতে ও খালে ইহাদের খোঁজ পাওয়া যায়। কড্ মাছের নাম বোধ করি তোমরা শুনিয়াছ।

ইহার যকৃতের তেল হইতে কড্ লিভার অয়েল তৈয়ারি হয়। ইহা সহজে হজম হয় এবং খাইলে শরীর মোটা হয়। এইজন্য

কড্ মাছ

ইহা দুর্ব্বল রোগীর খুব ভালো ঔষধ। যাহা হউক, কড্ মাছ তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে।

উকুন চাঁদা, পায়রা চাঁদা প্রভৃতি মাছ তোমরা দেখিয়াছ।
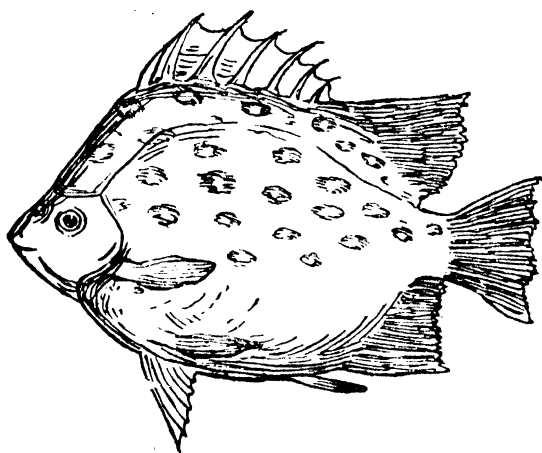
পায়রা চাঁদা

এগুলিও তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। এখানে কড্ মাছ ও

পম্ফয়রা চাঁদার ছবি দিলাম। দেখ, চাঁদা মাছের পিঠের ও পেটের ডানাগুলি পিঠ ও পেটকে প্রায় ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

চতুর্থ বর্গ

এই বর্গের (Lophobranchii) কোনো জানাশুনা মাছ আমাদের নদীতে বা খালে প্রায়ই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহারা থাকে সমুদ্রের জলে। চেহারাগুলি ইহাদের অদ্ভুত। এই-সব মাছের কান্‌কো সাধারণ মাছের মতো নয়। ইহা মাথার দুই ধারে গোছা গোছা করিয়া সাজানো থাকে।

পঞ্চম বগ

এই বর্গের (Plectogranthi) মাছও আমাদের নদী, খাল বা বিলের জলে দেখা যায় না। আমাদের টেপা মাছ ইহার মধ্যে পড়ে। টেপা মাছ তোমরা দেখ নাই কি? ইহার পেট ফোলা থাকে। এই দলের যে-সব মাছ সমুদ্রে আছে, তাহাদেরো অনেকের পেট ফোলা। কোনো-কোনোটিকে ডাঙায় উঠাইলে, তাহাদের পেট এত ফুলিয়া উঠে যেন সেগুলি এক-একটা গোলার মতো হইয়া উঠে। তখন তাহাদের ডানার কাঁটাগুলি খাড়া হইয়া দাঁড়ায়। টেপা মাছ লোকে খায়, কিন্তু সমুদ্রের টেপা মাছের গায়ে বিষ আছে বলিয়া সেগুলিকে কেহ খাইতে চায় না।

সমুদ্রের টেপা মাছ

এখানে সমুদ্রের টেপা মাছের একটা ছবি দিলাম। দেখ, কি বিশ্রী মাছ।

কোমলাস্থি মাছ

দৃঢ়াস্থি মাছ—অর্থাৎ যে-সব মাছের শরীরের হাড় শক্ত, তাহাদের কথা বলা হইল। ইহারাই যথার্থ মাছ। কোমলাস্থি অর্থাৎ যে-সব মাছের শরীরের হাড় নরম সেগুলিকে মাছ বলিলেও, সাধারণ মাছের সঙ্গে তাহাদের অনেক অমিল আছে।

তোমরা বোধ করি, কোমলাস্থি মাছ সকলে দেখ নাই। এগুলি প্রায়ই সমুদ্রে থাকে ; কখনো কখনো সমুদ্র হইতে নদীতেও আসে। হাঙ্গর, করাত মাছ, শঙ্কর মাহ, এই দলের অন্তর্গত।

এখানে একটা হাঙ্গরের ছবি দিলাম। ইহারা সাধারণ মাছের মতোই জল হইতে বাতাস টানিয়া নিশ্বাসের কাজ চালায়। এইজন্য অন্য মাছের মতো ইহাদেরো কান্‌কো আছে; কিন্তু কান্‌কোর ঢাক্‌নি নাই। ছবিতে দেখ, মাথার দুই পাশে পাঁচটি করিয়া লম্বা ছিদ্র আছে। ঐ পথ দিয়া নিশ্বাসের জল মুখ হইতে বাহিরে আসে। কাহারো কাহারো আবার মাথার উপরে দুইটি করিয়া ছিদ্র দেখা যায়। যখন

হাঙ্গর

মুখে খাবার থাকে, তখন মুখ দিয়া জল টানিবার উপায় থাকে না। ঐ সময়ে মাথার ছিদ্র দিয়া বাহিরের জল কান্‌কোয় পৌঁছায়। ইহাদের গায়ে এক রকম আঁশও দেখা যায়; কিন্তু তাহা সাধারণ মাছের আঁশের মতো নয়। অনেক মাছেরই পেটে পট্‌কা থাকে, কিন্তু হাঙ্গরের শরীরের ভিতরে পট্‌কা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহা হইলে দেখ, সাধারণ মাছদের সঙ্গে ইহাদের অনেক বিষয়ে অমিল আছে।

হাঙ্গরের মোটামুটি দুই উপজাতি দেখিতে পাওয়া যায়। ছোটো উপজাতির হাঙ্গর চারি পাঁচ হাতের বেশি লম্বা হয়

না। দিবারাত্রি খাওয়া লইয়াই ইহারা ব্যস্ত থাকে। খাবারের মধ্যে কাঁক্‌ড়া এবং মাছই ইহারা পছন্দ করে। বড় উপজাতির হাঙ্গরেরাই মানুষ খায়। এগুলি কখনো কখনো কুড়ি হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ইহারা ভয়ানক জানোয়ার! এই হাঙ্গরের মুখের একটা ছবি দিলাম। ধারালো দাঁতগুলি কি-রকমে সাজানো আছে, তোমরা ছবিতে তাহা দেখিতে পাইবে।
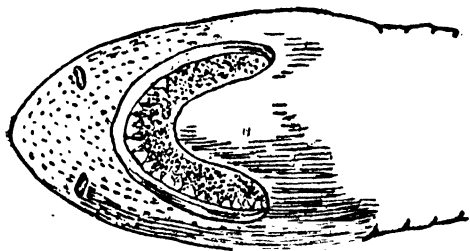
হাঙ্গরের মুখ

দেখ, হাঙ্গরের মুখ মাথার তলার দিকে রহিয়াছে। এইজন্য শিকার করিবার সময়ে ইহারা চিৎ হইয়া শিকারকে ধরে। বড় বড় হাঙ্গর জাহাজের সঙ্গে সাঁত্‌রাইয়া চলিতেছে, ইহাও কখনো কখনো দেখা যায়। জাহাজ হইতে যে-সব উচ্ছিষ্ট খাবার জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা খাইবার জন্যই ইহারা জাহাজের পিছনে পিছনে চলে। কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ যদি কেহ জলে নামে, তবে তাহার আর রক্ষা থাকে না। হাঙ্গরের গলার ছিদ্র খুব বড়। ইহারা এক-একটা গোটা মানুষকে গিলিয়া ফেলিতে পারে।

আমাদের কলিকাতার গঙ্গায় কখনো কখনো হাঙ্গর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা জোয়ারের জলের সঙ্গে

নদীতে আসিয়া পড়ে। সমুদ্র হইতে জলে জলে এক শত মাইল তফাতেও ইহাদিগকে আসিতে দেখা যায়।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, হাঙ্গরেরা মানুষ খায়, এইজন্য বুঝি উহাদের মাংস কেহ খায় না। কিন্তু তাহা নয়,—আফ্রিকার লোকে হাঙ্গরের মাংস খুব সখ করিয়া খায়। চীনেরা হাঙ্গরের ডানার ঝোল রাঁধিয়া খাইতে খুব ভালবাসে। তাই নানা দেশ হইতে হাঙ্গরের শুক্‌নো ডানা চীন দেশে আমদানি হয়।
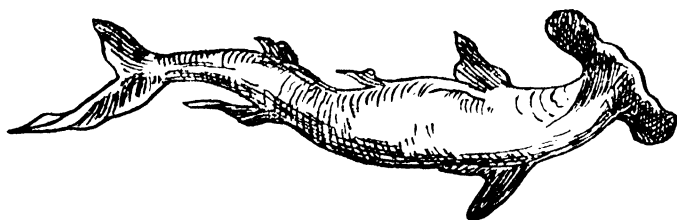
হাতুড়ি-মুখো হাঙ্গর

এখানে আর এক রকম হাঙ্গরের ছবি দিলাম। ইহাকে "হাতুড়ি-মুখো" (Hammer headed) হাঙ্গর বলে। মুখ-খানি ঠিক্ হাতুড়ির মতো নয় কি? এই হাতুড়ির মতো মুখের দুই প্রান্তে দুটো চোখ থাকে। কিন্তু দাঁত থাকে মুখের নীচেতেই। এই হাঙ্গরগুলিও আট নয় হাত লম্বা হয়। ইহারাও অতি ভয়ানক জন্তু।

করাত মাছ প্রায়ই নদীতে আসে না; ইহারা সমুদ্রেরই জন্তু। ইহাদিগকে কখনো কখনো দশ বারো হাত পর্য্যন্ত

লম্বা হইতে দেখা যায়। আমাদের বঙ্গোপসাগরে এই মাছ অনেক আছে। কলিকাতার যাদুঘরে তোমরা ইহার চেহারা দেখিতে পাইবে।

এখানে করাত মাছের একটা ছবি দিলাম। সমুদ্রের তলায় থাকে বলিয়া ইহাদের আকৃতি কতকটা চেপ্‌টা রকমের। ইহাদের মুখের উপরকার একটা অংশ তিন চারি হাত লম্বা লইয়া তরোয়াল বা করাতের মতো হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্য ইহার নাম করাত মাছ বা তরোয়াল মাছ।

করাত মাছ

শঙ্কর মাছ তোমরা দেখিয়াছ কিনা জানি না। ইহা আমাদের দেশের নদীতে প্রায়ই জেলেদের জালে ধরা পড়ে। সেগুলিও কিন্তু সমুদ্রের মাছ। করাত মাছের মতো সমুদ্রের তলায় চলা-ফেরা করে বলিয়া ইহাদেরও শরীর চেপ্‌টা। শঙ্কর মাছের পিছনে চাবুকের মতো এক-একটা লম্বা লেজ থাকে। এই লেজের উপর দিক্‌টাকে আবার করাতের মতো কাটা-কাটা দেখা যায়। অনেকে এই লম্বা লেজগুলিকে শুকাইয়া সত্যই চাবুক তৈয়ারী করে। তোমরা শঙ্কর মাছের চাবুক দেখ নাই কি?

উভচর

ব্যাঙ্

মেরুদণ্ডীদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর জন্তুদের কথা তোমা-দিগকে বলিলাম। এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর কথা তোমাদিগকে বলিব। ব্যাঙ্ এই দলের প্রধান প্রাণী। জলে ও ডাঙায় বাস করে বলিয়া ইহাদিগকে উভচর (Amphibia) বলা হয়। কোলা ব্যাঙ্ জলে বাস করে না,—অন্ধকারে ও স্যাঁত্সেঁতে ঘরের কোণে বা অন্য কোনো ভিজা জায়গায় ইহারা সমস্ত দিন চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। তা'র পরে সেই সব জায়গা হইতে সন্ধ্যার সময়ে চরিতে

ব্যাঙ্

বাহির হয়। ডাঙায় বাস করিলেও ইহারা জলে জন্মিয়া

ছোটো কালটা জলেই কাটাইয়া দেয়। কাজেই, কোলা ব্যাঙ্-দেরও উভচর বলিতে হয়। কিন্তু অন্য ব্যাঙেরা জল ছাড়িয়া সহজে ডাঙায় আসিতে চায় না। নাকগুলিকে উপরে রাখিয়া তাহারা প্রায়ই জলে ভাসিয়া বেড়ায়; ঢিল মারিলে টুপ্‌টাপ্ করিয়া ডুবিয়া গভীর জলে লুকাইয়া যায়। নদী, নালা প্রভৃতি জলাশয়ের কাছ ছাড়া শুক্‌না খট্‌খটে জায়গায় ব্যাঙেরা থাকিতে চায় না।

ব্যাঙ্‌দের পা চারিটি তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ কি? এবার যখন সন্ধ্যার আগে কোলা ব্যাঙ্‌গুলি তোমাদের বাড়ীর আঙিনায় বাহির হইবে তখন পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, তাহাদের পিছনের পা দু'টি বেশি লম্বা ও মজ্‌বুত। যখন তাহারা থাবা পাতিয়া বসিয়া থাকে, তখন ঐ লম্বা পা কোঁচ্‌কানো থাকে। এই পিছনের পায়ের উপরে ভর দিয়াই ব্যাঙেরা লম্বা লম্বা লাফ দিয়া চলে। সাঁত্‌রাইবার সময়েও উহাদের ঐ পা দু'খানিই বেশি কাজে লাগে। আমরা যেমন হাত-পা মেলিয়া জলে ধাক্কা দিতে দিতে সাঁতার কাটি, ব্যাঙেরা কিন্তু সে-রকমে সাঁতার দেয় না। তাহারা পিছনের পা দু'টিকেই বার বার গুটাইয়া ও ছড়াইয়া সাঁতার দেয়।

ব্যাঙের ডাক

ব্যাঙদের ডাক তোমরা শুনিয়াছ কি? কি বিশ্রী ডাক! গোঁ-গোঁ, কটর্-কটর্ কত রকমেই তাহারা ডাকে। এক

রকম ব্যাঙ্‌কে আমরা ঠিক্ ছাগলের মতো ব্যা-ব্যাঁ করিয়া ডাকিতে শুনিয়াছি। স্বর বিশ্রী হইলেও বর্ষার রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া ব্যাঙের ডাক শুনিতে মন্দ লাগে না।

খুব বৃষ্টি হইয়া গেলে যখন জলে ডিম পাড়িবার সুবিধা হয়, সেই সময় ব্যাঙ্‌দের ডাক বেশি শুনিতে পাওয়া যায়। তখন কুনো কোলা ব্যাঙ্ পর্য্যন্ত সকলেই লাফাইতে লাফাইতে জলে পড়িয়া প্রাণ খুলিয়া চেঁচাইতে আরম্ভ করে। গরমের সময়ে যখন বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকে, তখনও ব্যাঙেরা ডাকিতে সুরু করে। এই জন্যই লোকে বলে চৈত্র-বৈশাখ মাসে ব্যাঙ্ ডাকিলেই বৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সময়ের ডাক বর্ষাকালের ডাকের মতো নয়; খুব নীচু গলায় তা'রা দুই-চারিবার কুটুর কুটুর শব্দ করে মাত্র। বোধ করি বাতাসের জলীয় বাষ্পে তাহারা আরাম পায়।

ব্যাঙেরা কি-রকমে ডাকে তাহা বোধ করি তোমরা জানো না। আমরা যখন গান করি, বা চীৎকার করিয়া কাহাকেও ডাকি, তখন ফুস্‌ফুসের বাতাস গলার ভিতরকার স্বর-যন্ত্রের উপর দিয়া চালাইয়া মুখ দিয়া বাহির করিয়া দিই। তাই গান গাহিতে গেলে বা চীৎকার করিতে গেলে আমাদিগকে হাঁ করিতে হয়। ব্যাঙেরা চীৎকার করিবার সময়ে ফুস্‌ফুসের বাতাস গলার স্বর-যন্ত্রের উপর দিয়া মুখে আনে বটে, কিন্তু তাহা হাঁ করিয়া ছাড়িয়া দেয় না। মুখের বাতাসকে আবার গলা দিয়া ফুস্‌ফুসে লইয়া যায়। এই রকমে একই বাতাসকে বার

বার ভিতর বাহির করিয়া তাহারা চেঁচাইতে থাকে। এইজন্যই ডাকিবার সময়ে ব্যাঙ্‌দের মুখ খুলিয়া চীৎকার করিতে দেখা যায় না। পরীক্ষা করিয়ো, দেখিবে, ব্যাঙের দল পুকুরের জলে গোঁ-গোঁ করিতেছে, অথচ তাহাদের একটিরও মুখ খোলা নাই।

ব্যাঙের শত্রু।

ব্যাঙেরা কাহারো কিছু অনিষ্ট করে না। বরং যে-সব ছোটো পোকা-মাকড় আমাদের অনিষ্ট করে, তাহাদিগকে খাইয়া ইহারা লোকের উপকারই করে। তথাপি ব্যাঙের শত্রুর অন্ত নাই। ব্যাঙ্, সাপদের প্রিয় খাদ্য। সুবিধা পাইলে কচ্ছপেরাও উহাদিগকে খাইতে ছাড়ে না। যখন অন্য খাবার পাওয়া যায় না, তখন কাক, বক ও চিলের দলও ব্যাঙের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সব শত্রুর জন্য এই নিরীহ প্রাণীরা অন্ধকার জায়গায় বা জলের নীচে লুকাইয়া থাকিতে চায়।

মানুষও ব্যাঙের কম শত্রু নয়। ব্যাঙের ঠ্যাং নাকি বড় উপাদেয় খাদ্য! তাই আজকাল অনেক দেশে ব্যাঙের মাংসের বড় আদর। ব্যবসায়ের জন্য লোকে যেমন হাঁস মুরগী প্রভৃতি পালন করে, এখন আমেরিকায় সেই-রকমে ব্যাঙ্ পালন করা হইতেছে। মোটা মোটা ব্যাঙ্ আমেরিকার অনেক বাজারেই আজকাল বিক্রয় হয়। তাহা

হইলে দেখ, কত লক্ষ লক্ষ ব্যাঙ্ শত্রুর হাতে সর্ব্বদাই মারা পড়ে।

ব্যাঙেরা জলে যে ডিম ছাড়ে সেগুলির শত্রুও কম নয়। মাছ, বক এবং জলের নানা পোকা-মাকড় ব্যাঙের ডিম খাইতে খাইতে ভালবাসে। কাজেই এই সব শত্রুর দৃষ্টি হইতে যে-ডিমগুলি রক্ষা পায়, কেবল সেইগুলি হইতেই বাচ্চা বাহির হয়।

অন্ধকার রাত্রিতে আলো জালিলে পোকার দল উড়িতে উড়িতে আলোর কাছে আসে এবং কোনো কোনোটি আলোতে ঝাঁপাইয়া পুড়িয়া মরে। কিন্তু তবুও তাহারা আলোর কাছ-ছাড়া হয় না। এই-সব প্রাণীর উপরে আলোর এমন একটি শক্তি আছে, যাহা তাহা তাহাদিগকে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারে। এই শক্তিকে ছাড়াইয়া পালাইবার ক্ষমতা পোকাদের নাই। ব্যাঙের উপরেও আলোর সেই-রকম একটা শক্তি আছে। তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ো, রাত্রিকালে সম্মুখে আলো ধরিলে ব্যাঙেরা আলোর দিকে মুখ ফিরাইয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবে; তখন তাড়া দিলেও উহারা দূরে যাইবে না।

তোমরা হয় ত প্রাণীদের মধ্যে মানুষকেই বুদ্ধিমান্ মনে কর। কিন্তু তাহা নয়, অন্য প্রাণীদের মধ্যেও কোনো কোনোটি বেশ বুদ্ধিমান। শিয়াল, কুকুর, ঘোড়া, হাতী সকলেই বুদ্ধিমান্ প্রাণী। কিন্তু ব্যাঙেরা ভয়ানক বোকা। বহু চেষ্টা করিলেও ইহারা পোষ মানে না। একটি লোক প্রাচীর

দিয়া ঘেরা কোনো জায়গায় একটি ব্যাঙ্‌কে আট্‌কাইয়া রাখিয়াছিলেন। সেই ঘেরা জায়গা হইতে বাহির হইবার একটি লুকানো পথ ছিল। কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া দুইবার দেখিয়াই সেই পথ চিনিয়া ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে পারিয়াছিল, কিন্তু এক শত বার যাওয়া-আসা করাইয়াও ব্যাঙ্‌কে পথ চিনানো যায় নাই। ইহাতে ব্যাঙ্‌কে বুদ্ধিমান্ বলা যায় কি ?

ব্যাঙের আকৃতি-প্রকৃতি

অনেক জন্তু-জানোয়ার শরীরে মুণ্ড, ধড় ও ঘাড় এই তিনটা অংশ আছে। কিন্তু তোমরা ব্যাঙের দেহে ঘাড়ের সন্ধানই পাইবে না। অধিকাংশ বড় প্রাণীর ঘাড় মেরুদণ্ডের সাতখানা হাড় (কশেরুকা) দিয়া তৈয়ারী হয়। মানুষ, গরু, ছাগল, ভেড়া অনেক প্রাণীতেই ইহা দেখা যায়। কিন্তু ব্যাঙের ঘাড়ে একখানার বেশি কশেরুকার হাড় দেখা যায় না। কাজেই ইহাদের ঘাড়ে গরদানে এক। এইজন্যই বোধকরি ব্যাঙ্‌দের চেহারা এত বিশ্রী।

ব্যাঙের মাথাটি কি-রকম তোমরা দেখ নাই কি ? আকৃতিতে ইহা যেন তিন-কোণা। তা'র পরে আবার পিছনে লেজ নাই। লেজ থাকিলে হয় ত ব্যাঙ্‌কে মন্দ দেখাইত না। কিন্তু ইহাদের চোখগুলি নিতান্ত মন্দ নয়,—ড্যাবা-ড্যাবা দুইটা চোখ মাথার দুই পাশে উঁচু হইয়া থাকে। যখন

ইহারা চোখ বোঁজে তখন চোখের গর্ত্তের ভিতর সেই চোখ টানিয়া লয়। রাত্রিতে চোখ দু'টা যেন জ্বল্-জ্বল্ করিতে থাকে। এইজন্যই বোধ হয় লোকে বলে ব্যাঙের মাথায় মাণিক আছে।

ব্যাঙের কান তোমরা বোধ হয় দেখ নাই। দুই চোখের পিছনে পাত্‌লা চামড়ায় ঢাকা, ব্যাঙ্‌দের কান থাকে। ব্যাঙের মুখখানি কি-রকম তোমরা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ো,—এত ছোট জন্তুর মুখে অত বড় হাঁ প্রায়ই দেখা যায় না। হাঁ করিলে ইহাদের এক কানের তলা হইতে অন্য কানের তলা পর্য্যন্ত ফাঁক হইয়া যায়।

ব্যাঙ দের সম্মুখের ছোটো পা-দুখানিতে চারিটি করিয়া আঙুল থাকে। খুব ভালো করিয়া দেখিলে বুড়ো আঙুলেরও একটু চিহ্ন দেখা যায়। কাজেই ইহাকে আঙুলের মধ্যে ধরা যায় না। কিন্তু পিছনের পায়ে থাকে পাঁচটি করিয়া আঙুল। এগুলি পাত্‌লা চামড়ায় হাঁসের আঙুলের মতো পরস্পর জোড়া থাকে। তাই ব্যাঙেরা পিছনের পা নাড়িয়া সাঁত্‌রাইতে পারে।

তোমরা ব্যাঙের গায়ে বোধ হয় হাত দিয়া দেখ নাই। হাত দিতে ঘৃণা হয়। মাছদের মতো ইহাদেরও গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা। তাই লাফাইতে লাফাইতে গায়ে বা পায়ে আসিয়া ঠেকিলে তাহাদিগের শরীর ঠাণ্ডা বলিয়া বোধ হয়। তোমরা যদি সাহস করিয়া ব্যাঙের গায়ে হাত দিয়া দেখিতে পার, তবে দেখিবে ইহাদের চামড়া অন্য প্রাণীর চামড়ার

মতো গায়ে টান করিয়া লাগানো নাই। তোমরা বুড়া মানুষের গায়ের চামড়া দেখিয়াছ ত? ব্যাঙের চামড়া যেন সেই-রকমেই ঝোলা-ঝোলা এবং আল্‌গা। কিন্তু এই চামড়ার উপরে লোম, আঁশ বা পালক কিছুই লাগানো থাকে না। অনেক ব্যাঙেরই গা বেশ তেলা। কিন্তু কোলা ব্যাঙের মাথায় ও গায়ে ফোলা-ফোলা ফুস্‌কারির মতো অংশ লাগানো থাকে। তোমরা ইহা দেখ নাই কি? এই ফোলা অংশগুলিকে মাংস-গ্রন্থি (Glands) বলে। সেগুলি হইতে অনেক সময়ে বিষ-রস বাহির হইয়া চামড়ার উপরে আসে। তাই এই-সব ব্যাঙ্‌কে পাখী বা অন্য প্রাণী হঠাৎ খাইতে চায় না। এগুলি ছাড়া ইহাদের আরো এক-রকম মাংস গ্রন্থি থাকে। তাহা হইতেও আর এক রকমের রস বাহির হয়। এই রসে ব্যাঙের গা সর্ব্বদা ভিজা থাকে।

ব্যাঙের গায়ের রঙ্ হয় ত তোমরা দেখিয়াছ। রকম রকম ব্যাঙের গায়ে রকম রকম রঙ্ দেখা যায়। বুড়ো কোলা ব্যাঙের মাথায় চন্দনের ছিটা-ফোঁটার মতো লাল রঙ্ তোমরা দেখ নাই কি? খড়ের গাদা বা আবর্জ্জনার মধ্যে যে-সব ব্যাঙ্ লুকাইয়া থাকে, তাহাদের রঙ্ প্রায়ই কালো হয়। আবার সেই ব্যাঙ্‌কেই যদি পরিষ্কার জায়গায় আট্‌কাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে কয়েক দিনের মধ্যে তাহাদের গায়ের সেই রঙ্ বদ্‌লাইয়া ফিকে হইয়া দাঁড়ায়। ব্যাঙেরা যেন বহুরূপী প্রাণী। ইহা ছাড়া হল্‌দে সোনা

ব্যাঙ্; সবুজ গেছো ব্যাঙ্ ইত্যাদি কত রঙেরই যে ব্যাঙ্ থাকে তাহা ঠিকই করা যায় না।

ব্যাঙ্দের চামড়ার তলায় রঙে-ভরা কতকগুলি কোষ থাকে। বাহিরের আলো ইত্যাদিতে সেই-সকল কোষ কখনো সঙ্কুচিত কখনো প্রসারিত হয় বলিয়াই উহাদের গায়ের রঙ্ বদ্লায়।

এখানে ব্যাঙের শরীরের ভিতরকার হাড়গুলির একটা ছবি দিলাম। ব্যাঙের পায়ে কতকগুলি করিয়া আঙুল আছে, তাহা এই ছবিতে তোমরা গুণিয়া দেখিতে পারিবে। দেখ, ব্যাঙের পাঁজরায় হাড় একখানিও নাই।

ব্যাঙের হাড়

ব্যাঙের আহার ও হজমের ব্যবস্থা

ছোট পোকা-মাকড় ব্যাঙ্দের প্রধান আহার। কিন্তু এই আহারে তাহাদের খুব সৌখিনতা আছে কুকুর, শেয়াল, কাক, চিল সকলেই মরা জন্তু খায়। কিন্তু ব্যাঙের মুখে মরা পোকা-মাকড় রুচে না। যে-সব পোকা-মাকড় সম্মুখে নড়িয়া-চড়িয়া বেড়াইতেছে, সেইগুলিকে ধরিয়া তাহারা মুখের ভিতরে পোরে। যে পোকাটি সম্মুখে স্থির হইয়া

বসিয়া আছে, তাহাকে ব্যাঙেরা প্রাণান্তে ছোঁয় না। বোধ করি, ব্যাঙেরা ভাবে ঐ পোকা বুঝি মরা। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, ব্যাঙেরা পা দিয়া পোকাদের ধরিয়া মুখে পোরে। কিন্তু তাহা নয়। ইহাদের আহার করা এক মজার ব্যাপার। তোমরা সুবিধা পাইলে, ব্যাঙের পোকা শিকার করা দেখিয়ো। ইহারা জিভ দিয়া পোকা-মাকড় ধরিয়া মুখে পোরে।

ব্যাঙ্ কি করিয়া জিভ দিয়া পোকা ধরে, এখানে তাহার তিনটি ছবি দিলাম। প্রথম ছবিটিতে জিভটিকে দেখ। আমাদের জিভের গোড়াটা যেমন থাকে গলার কাছে এবং জিভের ডগা থাকে দাঁতের গোড়ায়, ব্যাঙ্দের জিভ সে-রকমে মুখে লাগানো থাকে না। ছবি দেখিলেই বুঝিবে, জিভের গোড়া রহিয়াছে দাঁতের কাছে লাগানো এবং তাহার ডগা আছে গলার দিকে। সম্মুখে পোকা-মাকড় নড়িয়া বেড়াইলেই ব্যাঙেরা সেই কিন্তুতকিমাকার মোটা জিভগুলিকে বাহির করিয়া পোকার গায়ে লাগাইয়া দেয়। জিভে এক-রকম আঠার মতো লালা লাগানো থাকে। পোকা সেই আঠায় জিভে আট্‌কাইয়া গেলে ব্যাঙেরা চট্ করিয়া জিভটাকে পোকা-সমেত মুখের

জিভ্ দিয়া শিকার করা

ভিতরে লইয়া যায়। ব্যাঙেরা এই-রকমে এত তাড়াতাড়ি পোকা ধরে যে, কখন জিভ বাহির করিল এবং কখনই বা জিভ মুখে পুরিল, তাহা ভালো করিয়া দেখাই যায় না।

ব্যাঙ্ কি-রকমে পোকা ধরিয়াছে, তোমরা তাহা উপরকার ছবিতে দেখিতে পাইবে। তা'র পরে কি করিয়া তাহারা সেই জিভ মুখের ভিতরে টানিয়া লয়, তাহা নীচের দু'খানি ছবি দেখিলেই বুঝিবে।

ব্যাঙের মুখের দাঁত বোধ করি তোমরা দেখ নাই। কিন্তু উহাদের দাঁত আছে। দাঁত থাকে উহাদের উপরকার চোয়ালে। ব্যাঙের দাঁত আমাদের দাঁতের মতো নয়। সে-গুলির উপরটা মোটা এবং নীচেরটা সরু। আমরা দাঁত দিয়া খাবার চিবাইয়া খাই। ব্যাঙেরা দাঁত দিয়া পোকা চাপিয়া ধরে,—চিবাইবার কাজে সেগুলির দরকার হয় না। অনেক দিন পোকা-মাকড় খাইতে খাইতে বুড়ো ব্যাঙদের দাঁত ক্ষয় হইয়া যায়। কিন্তু শিকার করা চাই ত? তাই দাঁত ক্ষয় হইলে বুড়ো বয়সেও তাহাদের নূতন দাঁত গজায়। বড় মজার ব্যাপার নয় কি?

মাছদের শরীরের যে-সব যন্ত্রের কথা বলিয়াছি, ব্যাঙ্দের শরীরেও তাহা আছে। সেগুলি ছাড়া ইহাদের নাড়ি-ভুঁড়ি অর্থাৎ অন্ত্রের কাছে ক্লোম (Pancreas) নামে একটা যন্ত্র আছে। ইহা হইতে এক রকম রস বাহির হয়, অন্য রসের মতো ইহাও খাবার জিনিসকে হজম করে। ব্যাঙ্দের যকৃত

খুব বড়। ইহা মাছদের যকৃতের মতোই পিত্ত-রস তৈয়ারী করে। এই রস যকৃতের উপরকার পিত্তকোষে জমা হয়। তা'র পরে খাবার হজম হইতে হইতে যখন অন্ত্রে আসিয়া হাজির হয়, তখন সেই পিত্ত-রস অন্ত্রে আসিয়া পড়ে। খাবারের সঙ্গে যে তেলা জিনিস থাকে পিত্ত-রস তাহাকেই হজম করে। তা'র পরে অন্ত্রের খাবারের সার জিনিস কি-রকমে সর্ব্ব-শরীরে ছড়াইয়া পড়ে তাহা মাছের বিবরণেই তোমাদিগকে বলিয়াছি।

শীতকালে ব্যাঙ্ বেশি দেখা যায় না। এই সময়ে তাহাদের কেহ মাটির তলায়, কেহ-বা আবর্জ্জনার মধ্যে লুকাইয়া ঘুমায়। খাওয়া নাই, দাওয়া নাই, দুই তিন মাস ধরিয়া এই-রকম ঘুম চলে! ইহা যেন ঠিক্ কুম্ভকর্ণের ঘুম। গায়ে ঠেলা দিলে বা গায়ে আগুন ঠেকাইলেও সে ঘুম ভাঙে না। এই ঘুমের সময়ে তাহারা নিশ্বাসও লয় না।

ব্যাঙেরা না খাইয়া কি-রকমে দুই তিন মাস কাটায় তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। বর্ষাকালে খাবার-দাবার সুবিধা হইবে না ভাবিয়া গৃহস্থেরা কি করে, তোমরা তাহা দেখ নাই কি? চাল, দাল, শুক্‌না কাঠ তাহারা ঘরে জমা রাখে। তাই সাত দিন সাত রাত্রি ধরিয়া অনবরত বৃষ্টি হইলেও গৃহস্থদের খাবার-দাবার অসুবিধা হয় না। শীতকাল আসিতেছে দেখিয়া ব্যাঙেরা ঐ-রকমেই দুই তিন মাসের খাবার জোগাড করিয়া রাখে। তোমরা হয় ত

ভাবিতেছ, উহারা পিঁপ্‌ড়েদের মতো গর্ত্তের ভিতরে খাবার সঞ্চয় করিয়া রাখে। কিন্তু তাহা নয়। খাবার জমা রাখে তাহাদের শরীরের ভিতরেই। বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত এই পাঁচ ঋতুতে ইহারা পেট ভরিয়া যত ইচ্ছা পোকা-মাকড় খাইয়া মোটা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই-সব খাবারের কতক সার অংশ যকৃতে জমা রাখে। তা'র পরে যখন তাহারা ঘুমাইতে আরম্ভ করে, সেই খাবারই ধীরে ধীরে যকৃত হইতে বাহির হইয়া রক্তের সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করে। ইহাতেই ব্যাঙেরা দুই মাস না খাইয়া আরামে ঘুমাইতে পারে। ভাবিয়া দেখ, ঈশ্বর কেমন সুন্দর ব্যবস্থা উহাদের শরীরে রাখিয়াছেন।

ব্যাঙ্‌দের নিশ্বাস-প্রশ্বাস

জলে বাস করিলেও নিশ্বাস লইবার জন্য মাছের মতো ব্যাঙ্‌দের কান্‌কো নাই। ইহারা নাক দিয়া শরীরের ভিতরে বাতাস টানিয়া তাহা ফুস্‌ফুসে লইয়া যায়। ইহা ছাড়া ব্যাঙেরা গায়ের চামড়া দিয়া বাতাস টানে এবং তাহাতে নিশ্বাসের কাজ চালায়। যে-সব ব্যাঙ্‌ সর্ব্বদা জলে থাকে, গায়ের চামড়া দিয়া তাহারা জলে-মিশানো বাতাস টানিতে পারে। মজার ব্যাপার নয় কি? নিশ্বাস টানার এই ব্যবস্থা শরীরে আছে বলিয়াই শীতকালে ঘুমাইবার সময়ে নাক দিয়া নিশ্বাস না লইয়াও ব্যাঙেরা বাঁচিয়া থাকে। গা দিয়া

নিশ্বাস টানার জন্যই ব্যাঙ্‌দের গা হইতে ঘামের মতো রস বাহির হয়।

মানুষ ও অন্য বড় জন্তুর পাঁজরে হাড় আছে। তাই তাহারা পাঁজরের হাড়গুলিকে ঠেলিয়া বুক ফুলাইতে পারে। ইহাতে নাক দিয়া যে বাতাস শরীরের ভিতরে যায় তাহা ফুস্‌ফুসে পৌঁছায়। তা'র পরে পাঁজরার হাড়গুলিকে বুকের দিকে সঙ্কুচিত করিলে সেই বাতাসই ফুস্‌ফুস্ হইতে আসিয়া নাক দিয়া বাহিরে আসে। সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের নিশ্বাস-প্রশ্বাস এই রকমেই চলে না কি? তোমরা বুকে ও পাঁজরে হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, বুক ফুলিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাসের বাতাস ফুস্‌ফুসে যাইতেছে এবং তা'র পরে বুক সঙ্কুচিত করার সঙ্গে নিশ্বাসের সেই বাতাসই নাক দিয়া বাহিরে আসিতেছে। কিন্তু তোমরা আগেই দেখিয়াছ, ব্যাঙ্‌দের পাঁজরার হাড় নাই। তাই তাহারা আমাদের মতো বুক ফুলাইয়া নিশ্বাস লইতে পারে না।

ব্যাঙ্‌দের নিশ্বাস লওয়া বড় মজার ব্যাপার। কোলা ব্যাঙ্ যখন পোকা শিকার করার জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তখন তোমরা ভালো করিয়া লক্ষ্য করিয়ো। দেখিবে, তাহার গলার নীচেটা বার-বার উঠা-নামা করিতেছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হইবে ব্যাঙ্‌টা বুঝি ডাকিতে আরম্ভ করিবে, তাই গলা নাড়াইতেছে। কিন্তু তাহা নয়, ঐ গলা উঁচু-নীচু করাই নিশ্বাসের লক্ষণ। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে আমাদের

বুক যেমন উঠা-নামা করে, উহাদের গলা সেই-রকমে উঠা-নামা করে।

ব্যাঙ্‌দের নিশ্বাসের বাতাস প্রথমে নাক দিয়া মুখে যায়। সেই সময়ে উহারা নাকের কপাট বন্ধ করিয়া মুখের তলাকে টাক্‌রার দিকে ঠেলিয়া তোলে, কাজেই তখন চাপা পাইয়া মুখের বাতাস ফুস্‌ফুসে ঢুকিয়া পড়ে। তা'র পরে শরীরের মাংসপেশীকে সঙ্কুচিত করিয়া তাহারা ফুস্‌ফুসের বাতাসকে আবার মুখে আনিয়া বাহির করিয়া ফেলে। ইহাই ব্যাঙ্‌দের নিশ্বাস-প্রশ্বাস।

তাহা হইলে দেখ, আমরা যেমন বাতাস টানিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস লই, ব্যাঙেরা ঠিক্‌ সে-রকমটি করে না। উহারা নাক দিয়া বাতাসকে মুখে আনে এবং তা'র পরে তাহাকে গিলিয়া ফুস্‌ফুসে চালান করে। ইহার জন্যই ব্যাঙ্‌দের গলা প্রত্যেক ঢোক গেলার সঙ্গে তালে-তালে উঠা-নামা করিতে থাকে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, তোমরা যদি জোর করিয়া কোনো ব্যাঙ্‌কে হাঁ করাইয়া রাখ, তাহা হইলে উহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়।

ব্যাঙের শরীরে রক্ত চলাচল

মাছদের মতো ব্যাঙ্‌দেরও শরীরে ধমনী শিরা উপশিরা সকলি আছে। হৃদ্‌পিণ্ডই রক্ত পম্প্‌ করিয়া ধমনী ও উপশিরা দিয়া সর্ব্বাঙ্গে চালায়। ব্যাঙের হৃদ্‌পিণ্ডে তিনটি

করিয়া কুঠারি থাকে। মাঝের কুঠারির হইতে রক্ত বাহির হইয়া দুইটা মোটা ধমনী দিয়া চলিতে থাকে। এই দুই ধমনীর প্রত্যেকে আবার তিনটি করিয়া শাখায় ভাগ হইয়া পড়ে। এ-গুলির মধ্যে একটি ফুস্‌ফুসে ও গায়ের ছালে, একটি মাথায় এবং আর একটি ধড়ের ভিতরে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলে।

যে-সব শিরা খারাপ রক্ত লইয়া ফুস্‌ফুসে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের ভিতরকার রক্ত পরিষ্কৃত হইলে হৃদ্‌পিণ্ডের বামদিকের কোটরে জমা হয়। আবার শরীরের যে খারাপ রক্ত তাহা অন্য শিরা দিয়া ডানদিকের কোটরে আসিয়া উপস্থিত হয়। কাজেই, একটা কোটরে থাকে তাজা ভালো রক্ত এবং আর একটা কোটরে থাকে মন্দ বদ্ রক্ত। শেষে এই দুই রক্তই মাঝের কোটরে আসিয়া ধমনী দিয়া আবার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে!

তাহা হইলে দেখ, খুব তাজা ভালো রক্ত ব্যাঙের ধমনী দিয়া চলা-ফেরা করে না। যে-সব জানোয়ারের হৃদ্‌পিণ্ডে চারিটি করিয়া কোটর আছে, কেবল তাহাদেরি রক্ত খুব তাজা অবস্থায় বাহির হইয়া ধমনী দিয়া ছুটিয়া চলে। তাজা রক্তই ফুস্‌ফুসের বাতাস হইতে বেশি অক্সিজেন্ টানিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি শরীরের কাজ চালায়। তাই যে-সব জন্তুর হৃদ্‌পিণ্ডে চারিটা করিয়া কুঠারি আছে, তাহাদের রক্ত এত গরম।

ব্যাঙের রক্তে লাল এবং সাদা দুই রকম কণিকাই দেখা

যায়। কিন্তু এই কণিকাগুলি অন্য প্রাণীর রক্তের কণিকার তুলনায় অনেক বড়।

রক্ত কি-রকমে ধমনী ও শিরার ভিতর দিয়া চলা-ফেরা করে, তাহা বোধ করি তোমরা দেখ নাই। ব্যাঙের পিছনের পায়ের আঙুলগুলি যে চামড়ায় পরস্পর জোড়া থাকে, তাহা খুব পাত্‌লা। একটা ব্যাঙ্‌কে ধরিয়া তাহার আঙুলের ঐ চামড়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলে, চামড়ার ভিতরকার রক্তের স্রোত স্পষ্ট দেখা যায়। আমরা এই-রকমে অনেকবার ব্যাঙের শরীরে রক্তের স্রোত দেখিয়াছি। স্রোতে যে লাল কণিকাগুলি ভাসিয়া বেড়ায়, তাহাও এই-রকমে দেখা যায়। তোমরা যদি কখনো অণুবীক্ষণ কাছে পাও, তবে ব্যাঙের রক্তের স্রোত দেখিয়া লইয়ো। ব্যাঙাচির লেজটিকে অণুবীক্ষণে দেখিলেও ঐ-রকম রক্তের স্রোত স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়।

ব্যাঙের বাচ্চা

মাছেরা যেমন কতক স্ত্রী ও কতক পুরুষ হইয়া জন্মে, ব্যাঙদের মধ্যেও ঠিক তাহাই দেখা যায়। কিন্তু এক দল ব্যাঙের মধ্যে কোন্‌গুলি স্ত্রী এবং কোন্ গুলিই-বা পুরুষ তাহা জানা মুস্কিল। পুরুষ ব্যাঙদের সম্মুখের পাঁচটি আঙুলের মধ্যে মাঝের আঙুলটি কিছু মোটা হয়। ব্যাঙেরা কিন্তু গরু, ঘোড়া বা ছাগলদের মতো বাচ্চা প্রসব করে না। স্ত্রী-ব্যাঙের পেটে অনেক ডিম জন্মে। এই-সব ডিম পেটের ভিতরে থাকিয়া পুষ্ট হইয়া শরীরের বাহিরে আসিলেই পুরুষ-

ব্যাঙ্ তাহাতে তাহার শরীরের এক-রকম রস মিশাইয়া দেয়। তা'র পরে সেই ডিমগুলি জলে ভাসিয়া বেড়ায়।

তোমরা ব্যাঙের ডিম দেখ নাই কি? অনেক দিন পরে বৃষ্টি হইলে পুকুরের বা খালের জলে যে জিউলির আঠার মতো জিনিস ভাসিতে দেখা যায়, তাহারি ভিতরে থাকে ব্যাঙের কালো কালো ডিম। এই ডিমগুলি মালার মত সেই আঠালো জিনিসের মধ্যে লুকানো থাকে। পাখীরাও ডিম প্রসব করে, এবং সর্ব্বদা ডিমের উপরে বসিয়া সেগুলিকে গরম রাখে। ত'ার পরে সেই-সব ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হয়। ডিম গরম রাখার এই-রকম হাঙ্গামা ব্যাঙ্‌দের মধ্যে একেবারেই নাই। তাহাদের গা ঠাণ্ডা। কাজেই, চিরকাল ডিম কোলে করিয়া বসিয়া থাকিলেও, সেগুলি কিছুতেই গরম হইত না। তাই, ব্যাঙেরা ডিম জলে প্রসব করিয়াই নিশ্চিন্ত হয়। জলের উপরে ভাসিয়া যে একটু রৌদ্রের তাপ পায়, তাহাতেই সেগুলি হইতে বাচ্চা বাহির হয়।

ডিম হইতে ব্যাঙ্‌দের যে বাচ্চা বাহির হয়, সেগুলির চেহারা কিন্তু একটুও ব্যাঙ্‌দের মতো নয়। একটা প্রকাণ্ড মাথা এবং তাহারি পিছনে মস্ত একটা লেজ,—ইহাই বাচ্চাদের প্রথম চেহারা। ইহাতে হাত বা পায়ের কোনো সন্ধানই পাওয়া যায় না। ব্যাঙের এই-রকম বাচ্চা তোমরা দেখ নাই কি? এই গুলিকেই আমরা ব্যাঙাচি বলি। ইহারাই নানা রকমে চেহারা বদ্‌লাইয়া শেষে ব্যাঙ্ হইয়া দাঁড়ায়।

যাহা হউক, ব্যাঙাচিরা বড় মজার জিনিস। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ব্যাঙ্‌দের ফুস্‌ফুস্‌ আছে এবং নাকের ছিদ্র
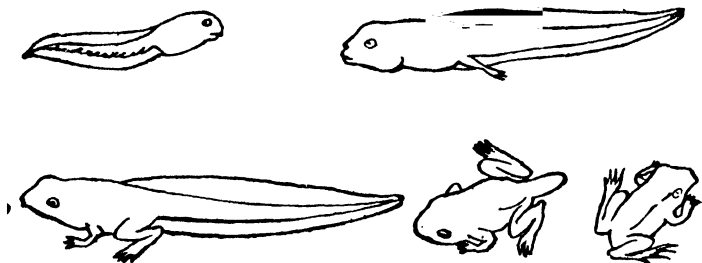
ব্যাঙাচি

আছে। কিন্তু ব্যাঙাচিদের শরীরে এ-গুলির নাম-গন্ধও নাই। তাহারা নিশ্বাস লয় জল হইতে। তাই মাছদের কান্‌কোর মতো, ইহাদের শরীরে কান্‌কো দেখা যায় এবং জল হইতে উঠাইলে তাহারা মারা যায়। ব্যাঙাচির শরীরে মুখ কোথায় থাকে, তাহা বোধ করি তোমরা দেখ নাই। ইহাদের কয়েকটিকে জল হইতে উঠাইয়া কাচের বোতলের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়ো। তাহা হইলে ব্যাঙাচিদের সব কাণ্ড-কারখানা তোমরা দেখিতে পাইবে। জল হইতে কিছু শেওলা আনিয়া বোতলে রাখিয়ো। তাহা না হইলে ব্যাঙাচিগুলা না খাইয়া মারা যাইবে। ব্যাঙাচিরা ছোটো-বেলায় শেওলা ও পচা লতাপাতা খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে। যাহা হউক, যখন ব্যাঙাচিরা বোতলের ভিতরকার শেওলা খাইবে, তখন স্পষ্ট দেখিবে, তাহাদের

মুখগুলি আছে মাথার তলায়,—অর্থাৎ ঠিক্ যেন হাঙ্গরের মুখের মতো।

ব্যাঙাচিরা এই-রকম অদ্ভুত চেহারা লইয়া চারি পাঁচ সপ্তাহ জলে বাস করে। কিন্তু এই সময়ে তাহাদের শরীরের যে-সব পরিবর্ত্তন হয় তাহা বড় আশ্চর্য্য! তোমরা যদি লক্ষ্য কর, তাহা হইলে দেখিবে, কয়েকদিন জলের শেওলা ও পচা লতাপাতা খাইয়া ব্যাঙাচিরা মোটা হইলে তাহাদের লেজের গোড়ার দুই পাশে দুইটা মাংসের পিণ্ড জড় হয় এবং শেষে এই দুইটিই কয়েক দিনে ব্যাঙাচির দু'খানা পা হইয়া দাঁড়ায়। তাহা হইলে দেখ, গাছে যেমন ফুলের কুঁড়ি গজায়, ব্যাঙাচির পিছনে সেই-রকমে দু'খানা পা গজায়।

যাহা হউক, পায়ের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙাচিদের শরীরে আরো অনেক পরিবর্ত্তন চলিতে থাকে। এই সময়েই একটু একটু করিয়া তাহাদের লেজ ছোটো হয় এবং কান্‌কোগুলি ছোটো হইয়া ভিতরে ফুস্‌ফুসের উৎপত্তি করিতে থাকে। তা' ছাড়া ইহাদের ছোট চোখগুলি বড় হইয়া যেন মাথা হইতে ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতে চায়। ব্যাঙের অনেক লক্ষণই এই সময়ে ব্যাঙাচির শরীরে প্রকাশ পাইতে থাকে।

এই-রকমে আধেক ব্যাঙের আকারে ব্যাঙাচিদের কয়েকটা দিন জলে কাটিয়া যায়। ইহার পরে তাহাদের সম্পূর্ণ ব্যাঙের চেহারা পাইবার সময় আসে। তখন মুখের দুই পাশে, আর দুইটি পায়ের অঙ্কুর ছালের তলায় বড় হইতে

আরম্ভ করে ; লেজ প্রায় থাকেই না, কান্‌কোর যে-একটু চিহ্ন ছিল, তাহাও লোপ পাইয়া যায়, এবং মাথাটি ও মুখ-খানি ঠিক ব্যাঙের মতো হইয়া দাঁড়ায়। এই সময়ে ব্যাঙাচিরা আর জলের ভিতরকার বাতাস টানিয়া নিশ্বাস লইতে পারে না ; নূতন মাথার নূতন নাকগুলিকে জলের উপরে তুলিয়া নিশ্বাস লইতে থাকে। ইহার পরে যখন ব্যাঙাচিদের লেজগুলি একবারে লোপ পাইয়া যায়, তখন তাহারা ডাঙ্গায় উঠিয়া লাফাইতে লাফাইতে ছোটো পোকা-মাকড় ও পিঁপ্‌ড়ে ধরিয়া খাইতে বাহির হয়। যখন তোমাদের পুকুরের ব্যাঙাচিরা ব্যাঙের আকার পাইয়া ডাঙ্গায় উঠিবে, তখন দেখিবে, যোগের সময়ে গঙ্গা-স্নানের যাত্রীরা যেমন স্নান করিয়া দলে দলে নদী হইতে ফিরিয়া আসে, হাজার হাজার বাচ্চা ব্যাঙ্‌ যেন সেই-রকমে চলিতেছে।

যাহা হউক, সব ছোটো ব্যাঙ্‌ই বাঁচিয়া বড় হইতে পায় না। ইহাদের অনেকেই মানুষের পায়ের চাপে, কাক ইত্যাদি পাখীদের উৎপাতে প্রাণ হারায়। এই-রকমে মরিয়া যাহা দুই দশটি বাকি থাকে, তাহারাই বড় হয়। ব্যাঙাচি হইতে যে-সব ব্যাঙ্‌ হয়, তাহাদের সকলগুলিই বাঁচিয়া যদি বড় হইত, তাহা হইলে কি ভয়ানক ব্যাপার হইত, একবার ভাবিয়া দেখ। তখন হয় ত, এই পৃথিবী ব্যাঙেরই রাজ্য হইত ; ব্যাঙের জ্বালায় তোমরা খাইবার শুইবার এবং বসিবার জায়গা-টুকুও পাইতে না।

নিজের গায়ের ছাল উঠাইয়া খাইতেছে, এমন প্রাণী তোমরা দেখিয়াছ কি? ব্যাঙেরা সেই-রকমেরই জন্তু। যখন ইহারা ছোট হইতে বড় হয়, তখন ইহাদের গায়ের চামড়া সাপের খোলসের মতো খুলিয়া আসে। তখন ব্যাঙেরা নিজেদের গা হইতে ছাল খুলিয়া গব্ গব্ করিয়া খাইতে আরম্ভ করে। নিজের গায়ের ছাল খাইতে তাহাদের একটু ঘৃণা করে না। দেখ, ব্যাঙেরা কি-রকম নির্ঘিন্নে জন্তু।

ব্যাঙের ইন্দ্রিয়

চোখ-কান ও নাকই ব্যাঙ্দের প্রধান ইন্দ্রিয়। সেগুলি শরীরের কোথায় থাকে, তাহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। ব্যাঙেরা যাহা খায় তাহার স্বাদ পায় কিনা, তাহা ঠিক করা যায় নাই। মুখের ভিতরকার অবস্থা দেখিলে যেন মনে হয়, উহারা যাহা খায় তাহার স্বাদ পায়; কাজেই কোন্ খাবারটি ভালো এবং কোন্ খাবারটিই বা মন্দ তাহা বুঝিয়া লইতে পারে। যে সব পোকা-মাকড় কাছে আসে ব্যাঙেরা সেই-গুলিকে ধরিয়া মুখে পোরে, কুকুর বিড়ালের মতো গন্ধ শুঁকিয়া উঁহাদিগকে খাবার খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না। তথাপি ব্যাঙ্দের কেন দুইটা বড় বড় নাক থাকে তাহা বুঝা যায় না। তাহা হইলে বলিতে হয়, ব্যাঙেরা নাক দিয়া কেবল নিশ্বাসই টানে।

কানের চেয়ে ব্যাঙ্দের চোখ দুইটা খুব ভালো। ইহাদের

চোখ কতকটা যেন মানুষেরই চোখের মতো। চোখে দু'খানি করিয়া পাতাও থাকে। তাই ব্যাঙেরা ইচ্ছা করিলে চোখ বুজিতে পারে। কিন্তু ইহাদের চোখের দৃষ্টি ভালো নয়। খুব দূরের বা খুব নিকটের জিনিস তাহারা ভালো করিয়া দেখিতে পায় না।

ব্যাঙের বিভিন্ন জাতি

আমাদের ভারতবর্ষে ব্যাঙ্‌দের বাইশ রকম জাতি এবং তাহাতে এক শত চৌত্রিশটি উপজাতি আছে। এই-সব রকম-রকম ব্যাঙ্‌দের মধ্যে কে কোথায় থাকে এবং তাহাদের চাল-চলন কি-রকম বলিতে গেলে ব্যাঙ্ সম্বন্ধেই একখানা বড় বই লিখিতে হয়। বর্ম্মা, আসাম, বোম্বাই ও মাদ্রাজ দেশে যত রকম-রকম ব্যাঙ্ দেখা যায়, আমাদের বাংলা দেশে তাহা দেখা যায় না।

কতকগুলি ব্যাঙ্ জলে ভাসিতেছে, হঠাৎ তাহাদের কাছে একটি ঢিল্ ফেলা গেল। অমনি ব্যাঙ্‌গুলি জলের উপর দিয়া ছপ্ ছপ্ করিয়া দৌড়াইয়া কিছু দূরে ডুব দিল। এই-রকম ব্যাঙ্ তোমরা দেখ নাই কি? এই ব্যাঙের আমরা নাম জানি না, কিন্তু তাহাদের আকৃতি দেখিয়াছি। এগুলি কখনই দুই বা তিন ইঞ্চির বেশি বড় হয় না। জলেই ইহাদের বাস। আমাদের ভারতবর্ষে ছয় সাত ইঞ্চি লম্বা এক জাতি ব্যাঙ্ আছে। তাহারা সুবিধা পাইলে নাকি হাঁসের বাচ্চা

ও মুরগীর ছানাও গিলিয়া খায়। আমরা এই ব্যাঙ্ দেখি নাই ; তোমরা দেখিয়াছ কি ?

কুনো ব্যাঙের কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। ইহারা ডাঙাতেই বাস করে, কিন্তু ডিম পাড়িবার সময় কাছের পুকুরে বা খালে ছুটিয়া যায়। ইহাদের গায়ের উপরে ঢিবি ঢিবি মতো অংশ থাকে। সেগুলি হইতে এক রকম বিষাক্ত রস বাহির হয়। এই বিষের ভয়ে কোনো জন্তু তাহাদিগকে খাইতে চায় না।

গেছো ব্যাঙ্ তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। ইহাদের পা চারিখানি এমন ভাবে তৈয়ারী যে, তাহারা অনায়াসে গাছের ডাল আঁক্ড়াইয়া থাকিতে পারে। গেছো ব্যাঙ্‌রা চট্ করিয়া গায়ের রঙ্ বদ্‌লাইতে পারে।

উভচরের অন্য বর্গ

কেবল ব্যাঙ্ লইয়াই যে উভচর শ্রেণী হইয়াছে, তাহা নয়। এই শ্রেণীতে আরও কয়েক বর্গের প্রাণী আছে। কিন্তু সেগুলিকে আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই না। বন-জঙ্গল ও পাহাড়ে তাহারা জন্মে। ব্যাঙ্ ছাড়া অন্য জ্যান্ত উভচর আমরাও দেখি নাই। তাই সেগুলির সম্বন্ধে কোনো কথা তোমাদিগকে বলিলাম না।

সরীসৃপ

মেরুদণ্ডী অর্থাৎ শির-দাঁড়াওয়ালা যে পাঁচ শ্রেণীর জন্তুর কথা তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি, তাহাদের মধ্যে মাছ এবং উভচর ব্যাঙের বিষয় তোমাদিগকে বলিলাম। এখন তৃতীয় শ্রেণীর জন্তু অর্থাৎ সরীসৃপের কথা তোমাদিগকে বলিব।

সরীসৃপেরা বড় মজার জন্তু। ইহাদের কাহারো গা আঁশের মত আবরণে ঢাকা থাকে, আবার কাহারো গা হাড়ের আবরণে ঢাকা দেখা যায়। কচ্ছপ, কুমীর, সাপ, গিরগিটি ও টিকটিকিরা এই শ্রেণীরই জন্তু। ইহাদের সকলেরই কিন্তু পা থাকে না। যাহাদের পা আছে, তাহাদের পা-গুলিকে প্রায়ই ছোটো হইতে দেখা যায়। তাই পা থাকিলেও ইহারা অন্য প্রাণীর মতো পায়ের উপরে শরীরের সমস্ত ভার রাখিয়া খাড়া হইয়া চলিতে পারে না। সন্ধ্যার সময়ে আলো জ্বালিলে যখন পোকা খাইবার জন্য টিকটিকি-গুলি দেওয়ালে বেড়াইবে, তখন তাহাদের চলা-ফেরা লক্ষ্য করিয়ো। দেখিবে, ছোটো চারিখানি পা দেওয়ালে আট্‌কাইয়া এবং তলপেট দেওয়ালের গায়ে লাগাইয়া তাহারা নড়াচড়া করিতেছে। কচ্ছপেরাও ঠিক এই রকমেই চলে।

সাপদের পা নাই। কাজেই বুকে না হাঁটিয়া ইহারা চলিতে পারে না।

তোমরা বোধ হয় মনে কর, সাপ, কুমীর প্রভৃতি সরীসৃপেরা আমাদের যত অনিষ্ট করে, অন্য কোন প্রাণী সে-রকম করে না। কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই নিরীহ,—সাপ ও কুমীরদের মধ্যে কেবল কয়েক জাতি মানুষের অপকার করে, তা'ছাড়া আর সকলেই মানুষের খুব উপকারী। ভোর হইলেই মাঠে, ঘাটে ও গাছে দলে-দলে কত পাখী বেড়াইতে আরম্ভ করে। কিন্তু তোমরা সরীসৃপদের কি সে-রকমে বেড়াইতে দেখিতে পাও? সাপ, কুমীর, কচ্ছপ প্রায়ই আমাদের নজরে পড়ে না। টিক্‌টিকি আমাদের ঘরে থাকে বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। গিরগিটিকে অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিতে হয়। তোমরা হয় ত বলিবে, সরীসৃপরা গর্ত্তে, জলে, ঝোপে-ঝাপে লুকাইয়া থাকে। কিন্তু তাহা নয়। অন্য জন্তুর তুলনায় সরীসৃপদের সংখ্যা বাস্তবিকই অল্প। কিন্তু অনেক হাজার বৎসর আগে এই পৃথিবী সরীসৃপেরই রাজ্য ছিল। তখন পৃথিবীতে মানুষ ছিল না, কেবল কোটী কোটী সরীসৃপই পৃথিবীর বন-জঙ্গলে ও নদী-নালার ধারে বাস করিত। টিক্‌টিকি ও গিরগিটিরা কত ছোটো জন্তু, তাহা তোমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাও। ইহাদের কেহই চারি বা পাঁচ আঙ্গুলের চেয়ে বেশি লম্বা হয় না। কিন্তু সে-কালের সরীসৃপরা সাড়ে তিন শত হাত

প্রাচীনকালের একটি সরীসৃপ—১০১ পৃঃ

পর্য্যন্ত লম্বা হইত। যখন তাহারা ঘাড় উঁচু করিয়া দাঁড়াইত, তখন ঝাউ ও শাল গাছকে ছাড়াইয়াও তাহাদের মাথা উঁচু হইত। সেই সব সরীসৃপ পৃথিবীতে আর নাই। মাটির অনেক তলায় তাহাদের যে-সব হাড় পাওয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়া এখন লোকে তাহাদের আকার-প্রকার বুঝিয়া লইতেছে।

এখানে একটা সে-কালের সরীসৃপের ছবি দিলাম। কি বিশ্রী চেহারা! দেখিলেই যেন ভয় হয়। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে ডাইনোসর। ভয় পাইবার কথা,—তাহারা উঁচু ছিল বত্রিশ হাত। মাটির তলায় ইহাদের যে হাড় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মাংস থাকিলে যে-রকমটি হয়, ছবিটিকে সেই রকমেই আঁকা হইয়াছে।

যাহা হউক, ঐ-সব আপদ্-বালাই আর পৃথিবীতে নাই। বাঁচা গিয়াছে। তাহা না হইলে আমরা এখন বাঘ ও সিংহকে যে-রকম ভয়
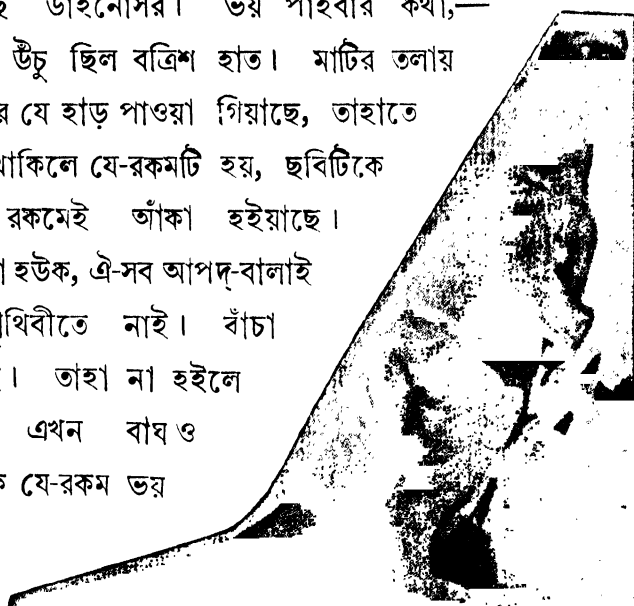
প্রাচীন কালের সরীসৃপ

করি, ঐ-সব সরীসৃপকেও সেই-রকম ভয় করিতাম

তাহা হইলে দেখ, এখনকার সরীসৃপদের মধ্যে কচ্ছপ, কুম্ভীর, টিক্‌টিকি ও গিরগিটি এবং সাপ, এই চারিটি বর্গ অর্থাৎ ছোটো দল আছে। আবার এই সব বর্গের প্রত্যেকটিতে অনেক জাতি ও উপজাতি আছে।

আমরা এখন একে-একে একটি-একটি বর্গের জন্তুদের কথা বলিব।

কচ্ছপ

তোমরা সকলেই হয় ত কচ্ছপ দেখিয়াছ। যদি না দেখিয়া থাক, তবে কলিকাতার আলিপুরের চিড়িয়াখানায় যখন বেড়াইতে যাইবে, তখন কচ্ছপের ঘরের দিকে একবার যাইয়ো। দেখিবে, সেখানে সমুদ্রের ও নদীর বড় বড় কচ্ছপ আনিয়া রাখা হইয়াছে।

এখানে কচ্ছপের একটা ছবি দিলাম। দেখ, অন্য বড় জন্তুদেরই মতো ইহাদের শরীরের মুণ্ড, ঘাড় ও ধড় এই তিন অংশ আছে। শরীরের উপর ও নীচে—দুই-ই শক্ত হাড়ের আবরণে ঢাকা। কচ্ছপের পিছনে আবার একটু লেজও আছে। ইহাদের পায়ের আঙ্গুল গুণিলে দেখা যায়, প্রত্যেক পায়েই পাঁচটি করিয়া
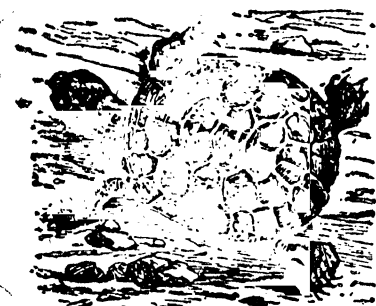
কচ্ছপ

আঙুল আছে। এই-সব আঙুলে আবার ধারালো নখও থাকে। মাটি ও বালি খুঁড়িবার জন্য উহাদের নখের দরকার হয়। আঙুলগুলি আবার ব্যাঙের পিছনের পায়ের আঙুলের মতো পাত্‌লা চামড়া দিয়া পরস্পর জোড়া দেখা যায়। তাই সেই-সব আঙুলে জল কাটিয়া কচ্ছপেরা সাঁতার দিতে পারে।

কচ্ছপদের পায়ের চামড়া কি-রকম তোমরা দেখ নাই কি? উহা বুড়া মানুষের গায়ের চামড়ার মতো থল্‌থলে ও ঝোলা, কিন্তু তাহা খুব মোটা। গলার ও মাথার উপরকার চামড়া কিন্তু সে-রকম নয়,—তাহা বেশ পাত্‌লা।

মাথাগুলি ছোটো হইলেও, কচ্ছপদের মুখের হাঁ নিতান্ত ছোটো নয়। কিন্তু উহাদের মুখে একটাও দাঁত থাকে না। শিঙ্‌ যে রকম নরম হাড় দিয়া প্রস্তুত হয়, সেই-রকম হাড় দিয়া উহাদের মুখের মাড়ী তৈয়ারী থাকে। ইহাই দাঁতের কাজ করে। এই-রকম শক্ত মাড়ী দিয়া কচ্ছপেরা জলের গাছপালার ছোটো ডাল কাটিতে পারে এবং কখনো কখনো তাহা দিয়া মানুষের আঙুল কাটিয়া লইয়াছে, ইহাও শুনা যায়।

যাহা হউক, কচ্ছপেরা কিন্তু বড় ভীতু জানোয়ার। নিজের শরীরটাকে বাঁচাইবার জন্য হাড়ের আবরণে গা ঢাকিয়াও ইহাদের ভয় ঘোচে না। সামান্য শব্দ পাইলেই তাহারা চম্‌কাইয়া উঠে এবং হাত পা লেজ মাথা সকলি,

শরীরের সেই আবরণের মধ্যে লুকাইয়া মরার মতো পড়িয়া থাকে।

কচ্ছপেরা যখন মাটির উপর দিয়া চলিয়া বেড়াইবে, তখন লক্ষ্য করিয়ো। দেখিবে, তাহারা শরীরের ভার চারি পায়ের উপরে রাখিয়া চলে না, পা দিয়া মাটি আঁকড়াইয়া শরীরটাকে যেন মাটির উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যায়। আগেই বলিয়াছি, যে-সব সরীসৃপের পা আছে, তাহারা এই রকমেই চলা-ফেরা করে।

কচ্ছপের ইন্দ্রিয়

কচ্ছপের ছুচ্‌লো মুখের উপরে খুব কাছে-কাছে দুইটি করিয়া নাকের ছিদ্র আছে। এই নাক দিয়া গন্ধ শুঁকিয়া ইহারা ডাঙায় ও জলে খাবার খুঁজিয়া বেড়ায়। কচ্ছপদের মাথার দুই পাশে যে দুইটি করিয়া চোখ আছে, সেগুলি কিন্তু খুব বড় নয়। এই ছোটো চোখগুলিতে তিনটি করিয়া পাতা দেখা যায়। তিনটি পাতার মধ্যে একটি চোখের উপরে এবং একটি নীচে থাকে। এই দুইটি দিয়া উহারা চোখ বুঁজিতে পারে। তৃতীয় পাতা থাকে চোখের ভিতরদিকের কোণে। দরকার হইলে ইহা দিয়াও কচ্ছপেরা চোখ বুঁজিতে পারে। কচ্ছপের কান চোয়ালের পাশে দেখা যায়। সামান্য শব্দেই ইহারা ভয় পায়। তাই মনে হয়, কান দিয়া ইহারা বেশ ভাল করিয়াই শুনিতে পায়।

কচ্ছপের খোলা

কচ্ছপের পিঠে ও পেটের তলায় যে দু'খানি শক্ত আবরণ আছে তাহাকে লোকে খোলা বলে। কিন্তু তাহা শামুক বা গুগ্‌লির খোলার মতো জিনিস নয়। কচ্ছপের পিঠের খোলা তাহাদের পাঁজ্‌রার হাড় দিয়া তৈয়ারি। আমাদের পাঁজরার হাড়গুলি কি-রকম তাহা তোমরা জানো। সেগুলি এক-একটা চওড়া কাঠির মতো নয় কি? কচ্ছপের পাঁজ্‌রার হাড়, আরো চওড়া হইয়া পরস্পরের সঙ্গে জোড় লাগানো থাকে। ইহাতেই তাহার পিঠের খোলা তৈয়ারি হয়। আবার বুকের হাড়ই বাহিরে আসিয়া পেটের তলার খোলা প্রস্তুত করে।

কতগুলি পাঁজ্‌রার হাড় জোড়া লাগিয়া পিঠের খোলা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা কচ্ছপের শরীর দেখিলেই তোমরা বলিতে পারিবে না। ভিন্ন ভিন্ন জাতির কচ্ছপের ঐ হাড়ের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হইতে দেখা যায়। পিঠের এবং পেটের তলার খোলা এক-রকম নরম হাড়ের টুক্‌রা দিয়া ঢাকা থাকে। এই জন্য পিঠের খোলায় কত খানা পাঁজরা আছে, তাহা হঠাৎ গুণিয়া বলা যায় না।

যাহা হউক, কচ্ছপের পিঠের ও পেটের খোলাগুলি বড় মজার জিনিস। আগে লোকে ঢাল দিয়া শরীর ঢাকিয়া তরোয়াল হাতে করিয়া লড়াই করিত। ইহা বোধ হয় তোমরা শুনিয়াছ। গায়ের খোলাগুলি কচ্ছপদের ঢালেরই কাজ করে। অন্য বলবান্ জন্তু ধরিতে আসিলে বা

কাম্‌ড়াইতে আসিলে, কচ্ছপেরা তাহাদের শরীরগুলিকে, ঐ খোলার ভিতরে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করে। খোলাগুলি এত শক্ত যে, লাঠি মারিলেও তাহা ভাঙ্গিয়া শরীরের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না। কচ্ছপদের গায়ের জোরও নিতান্ত অল্প নয়। বড় কচ্ছপের পিঠে ছোটো ছেলেকে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কচ্ছপ ছেলেকে পিঠে লইয়া ছুটিতেছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি।

চিৎ করিয়া রাখিয়া দিলে কচ্ছপেরা হঠাৎ উপুড় হইতে পারে না। এই অবস্থায় ইহারা পা ও মুখ খোলার মধ্যে পুরিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। তা'র পরে তাহাদের সেই লম্বা মুখগুলিকে মাটিতে ঠেকাইয়া চট্ করিয়া উপুড় হইয়া পড়ে। এইজন্য যাহারা কচ্ছপ শিকার করিতে যায়, তাহারা উহাদিগকে ধরিয়াই চিৎ করিয়া ফেলে। তা'র পরে সেগুলি যাহাতে পালাইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করে।

কচ্ছপের আহারাদি

কচ্ছপেরা জলের লতাপাতা, ছোটো মাছ এবং জলের পোকা-মাকড় সকলি খায়। নদীর জলে যে-সব মরা জন্তুর দেহ ভাসিয়া বেড়ায়, কচ্ছপেরা সেগুলিও খায়। জলের উপরে ছোটো বুনো হাঁস চরিয়া বেড়াইতেছে, বড় জাতির কচ্ছপেরা তাহাদিগকে ধরিয়া খাইয়াছে, ইহাও আমরা শুনিয়াছি।

কচ্ছপের পাকযন্ত্র কতকটা ব্যাঙের পাকযন্ত্রেরই মতো। ইহাদের মুখে জিভ থাকে, কিন্তু তাহা আমাদের জিভের মতো নয়। মল-মুত্র ত্যাগের এবং ডিম প্রসবের জন্য ইহাদের শরীরে পৃথক্ পথ নাই। উহারা ঐ তিন কাজ এক পথ দিয়াই চালায়।

এখানে কচ্ছপের হৃদ্‌পিণ্ডের একটা ছবি দিলাম। তাহাতে যে তিনটি কুঠারি আছে, তাহা তোমরা ছবিতে দেখিতে পাইবে। ব্যাঙের গায়ে যে-রকমে রক্ত চলাচল হয়, ইহাদের শরীরে প্রায় সেই রকমেই রক্তের স্রোত চলে। তাই কচ্ছপের শরীরের রক্ত খুব নির্ম্মল থাকে না।
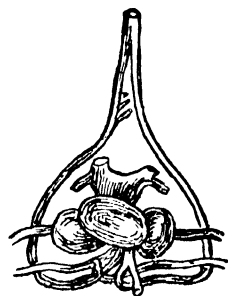
কচ্ছপের হৃদ্‌পিণ্ড

ব্যাঙাচি ও মাছেরা যেমন কান্‌কো দিয়া জলে-মিশানো বাতাস হইতে অক্সিজেন্ টানিয়া লয়, কচ্ছপেরা সে-রকমে অক্সিজেন্ লয় না। ইহাদের বুকের ভিতরে ফুস্‌ফুস্ আছে। এইজন্য আমাদেরি মতো নাকের ছিদ্র দিয়া উহারা বাতাস টানে। নিশ্বাসের কাজের জন্য বাতাসের দরকার বলিয়াই কচ্ছপেরা জলে থাকিবার সময়ে শুঁড়গুলিকে জলের উপরে ভাসাইয়া রাখে। জোর করিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিলে ইহাদের দম আটকাইয়া যায়।

কচ্ছপের বাচ্চা

মাছ ও ব্যাঙের মতো কচ্ছপদেরও কতক স্ত্রী এবং কতক পুরুষ হইয়া জন্মে। স্ত্রী-কচ্ছপ ডিম প্রসব করে। তা'র পরে সেই-সব ডিম হইতে ছোটো ছোটো বাচ্চা বাহির হয়।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, ব্যাঙ্দের মতো ইহারা জলে ডিম প্রসব করে। কিন্তু তাহা নয়। নখ দিয়া নদী বা বিলের ধারের বালি খুঁড়িয়া কচ্ছপেরা সেখানে ডিম প্রসব করে, এবং সেগুলিকে বালি দিয়া ঢাকিয়া রাখে। তা'র পরে রৌদ্রের তাপ পাইলে ডিম ফুটিলে বাচ্চা বাহির হয়।

প্রসব করার পরে কচ্ছপেরা নিজের ডিমের একটুও সন্ধান লয় না। তোমরা হয় ত কচ্ছপের ডিম দেখ নাই। সেগুলি হাঁসের ডিমের মতো সাদা খোলায় ঢাকা থাকে। দেখিতে হাঁসের ডিমের চেয়েও ছোটো এবং গোল। ডিম পাড়িয়া বোধ হয় কচ্ছপেরা ভাবে, সব ডিম হইতেই বুঝি বাচ্চা হইবে। কিন্তু তাহা হয় না। কচ্ছপের ডিমের প্রধান শত্রু শিয়াল ও বেজি। কোথায় কচ্ছপের ডিম আছে, তাহা উহারা খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করে এবং ডিমগুলিকে খাইয়া ফেলে। কচ্ছপের ডিম নাকি খাইতে ভালো। তাই একদল লোকে নদীর চরের বালি ঘাঁটিয়া কচ্ছপের ডিম খুঁজিয়া বাহির করে। তাহা হইলে দেখ, কচ্ছপদের শত্রু অনেক। এই সব উৎপাত হইতে যে-কয়েকটি ডিম রক্ষা পায়, কেবল সেইগুলি হইতেই বাচ্চা বাহির হয়।

কচ্ছপের বাচ্চাদেরও শত্রু কম নয়। কাক, চিল প্রভৃতি পাখীরা ইহাদের ছোটো বাচ্চাগুলিকে দেখিলেই ধরিয়া খাইয়া ফেলে এই-রকমে নষ্ট হওয়ার পরে, যেগুলি বাঁচিয়া থাকে, তাহারাই জলে থাকিয়া শুঁড় উঁচু করিয়া বেড়ায় এবং নদীর ধারে উঠিয়া রোদ্ পোহায়।

কচ্ছপের বিভিন্ন জাতি

কচ্ছপ যে কত রকমের আছে, তাহা তোমাদিগকে বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। নানা দেশের সমুদ্রে ও নদীতে নানা রকমের কচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কোনো কোনো জাতির কচ্ছপ ডাঙাতেই বাস করে। সমুদ্রের এক-একটা কচ্ছপ পাঁচ ছয় হাত পর্য্যন্ত চওড়া হয়। ভাবিয়া দেখ, তাহারা কি ভয়ানক জন্তু!

আমাদের বাংলা দেশে যে-সব কচ্ছপ খাল, বিল ও নদীর জলে এবং ডাঙায় দেখা যায়, সেগুলিকে হয় ত তোমরা কেহ কেহ দেখিয়াছ। আগে তোমাদিগকে তাহাদেরি কথা বলিব।

ছেতেন কচ্ছপের নাম তোমরা শুন নাই কি? ইঁহাদিগকে কোনো কোনো জায়গায় ঢালি কচ্ছপও বলে। এগুলি আকারে নিতান্ত ছোটো হয় না, কোনো কোনোটিকে এক হাত হইতে দেড় হাত পর্য্যন্ত চওড়া হইতে দেখা যায়। মরা জন্তু-জানোয়ার জলে ভাসিতে থাকিলে, ইহারা দলে দলে তাহা খাইতে আরম্ভ

করে। ছোটো মাছও ইহাদের গ্রাস হইতে রক্ষা পায় না। নদীর চরে ইহাদিগকে প্রায়ই রোদ পোহাইতে দেখা যায়। কিন্তু কাহাকেও তাড়া করিয়া কামড়ায় না। মানুষের সাড়া পাইলে ইহারা নদীর ধার হইতে ঝুপঝাপ করিয়া জলে ঝাঁপ দেয়।

সিম্ কচ্ছপ তোমরা হয় ত সকলে দেখ নাই। এগুলি পূর্ব্ব-বঙ্গের নদী ও খালে বা বড় দীঘিতে দেখা যায়। ইহাদের পিঠের খোলা খুব উঁচু নয়, কতকটা যেন শঙ্কর মাছের মতো চেপ্টা। এই কচ্ছপের কোনো কোনোটা তিন চারি হাত পর্য্যন্ত চওড়া হয়। পূর্ব্ববঙ্গের লোকে সিম্ কচ্ছপের খোলাকে ঝুড়ি বা টুক্রীর কাজে লাগায়।

খালে বিলে ও পুকুরে যে-সব কচ্ছপ থাকে, তাহাদের মধ্যে কাঠা ও কেঠো কচ্ছপ হয় ত তোমরা দেখিয়াছ। এগুলি কখনো কখনো এক হাত পর্য্যন্ত চওড়া হয়। ইহাদের পিঠের খোলার আবার চৌকো ছক্ কাটা থাকে। নদীতেও কখনো কখনো কেঠো কচ্ছপ দেখা যায়। ইহারা মরা জন্তু-জানোয়ার খায় না; পচা লতাপাতাই প্রধান আহার। কেঠোর মাংস সুস্বাদু বলিয়া লোকে এগুলিকে নানা ফন্দি করিয়া ধরে।

সুঁদি কচ্ছপ প্রায়ই ডাঙায় থাকে। জল হইতে অনেক দূরে, ভিজে মাটিতে ইহাদের দেখা যায়। কখনো আবার গর্ত্ত করিয়া ইহারা মাটির নীচে পড়িয়া থাকে। মাটিতে লাঙ্গল দিবার সময়ে লোকে লাঙ্গলের ফালে ইহাদিগকে পায়।

সুঁদি কচ্ছপ প্রায়ই এক হাতের বেশি চওড়া হয় না। অন্য কচ্ছপদের মতো ইহাদের গায়ের রঙ্ কালো নয়,—কতকটা যেন হল্‌দে ; আবার তারি উপরে কালো কালো দাগ থাকে। অনেক লোকে ইহাদেরও মাংস খায় ; তাই মানুষের উৎপাতে ইহারা লুকাইয়া বেড়ায়। সুঁদি কচ্ছপেরা গভীর জলে থাকিতে পারে না। তাই জলে লুকাইলেও উহারা মানুষের হাত হইতে উদ্ধার পায় না। লোকে দলে দলে জলে নামিয়া বর্ষা বা ট্যাটার খোঁচা মারিয়া কাদার ভিতর হইতে সেগুলিকে বাহির করে।

পূর্ব্ববঙ্গের জায়গায় জায়গায় তারাবুনো নামে একজাতি কচ্ছপ আছে। ইহাদিগকে তোমরা বোধ করি দেখ নাই। ইহারাও ডাঙ্গায় থাকে ; কিন্তু খোলা জায়গা পছন্দ করে না। ঝোপ-জঙ্গলের তলাতেই ইহাদের বাস। তারাবুনোর খোলা বেশ উঁচু এবং প্রায় এক হাত চওড়া হয়। খোলার উপরে আবার হল্‌দে দাগ থাকে। ইহাদের মাংস নাকি দেখিতে কালো, তাই লোকে খায় না।

ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায় ইন্দ্রী বা কড়ি কেঠো নামে এক জাতি কচ্ছপ দেখা যায়। সেগুলি বড় মজার জন্তু তাহারা জলে থাকে, কিন্তু আকারে কখনই তিন বা চারি ইঞ্চির বেশি হয় না। মেলার সময়ে যে-সব খেল্‌না কচ্ছপ বিক্রয় হয়, এগুলি তাহারো চেয়ে ছোটো। মজার জন্তু নয় কি? ইন্দ্রী কেঠোর খোলার সম্মুখের দিক্‌টা চওড়া এবং

পিছনের দিক্‌টা সরু। আবার খোলার মাঝামাঝি অংশটা যেন কাটা-কাটা। ইহাদের গায়ের রঙ্ বাদামি,—সাধারণ কচ্ছপদের মতো কালো নয়। পেটের তলার খোলার রঙ্ আবার হল্‌দে ও লালে মিশানো। নদী বা খালের জলে যে-সব ঝোপ-জঙ্গল থাকে, এই কচ্ছপেরা তাহারি উপরে বসিয়া রোদ পোহায়। ইহারা বড় ভীতু,—একটু শব্দ হইলেই ঝুপ্‌ঝাপ করিয়া জলে ঝাঁপ দেয়।

যে-সব কচ্ছপ সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে, আমরা কেবল সেগুলিরই কথা তোমাদিগকে বলিলাম। ইহা ছাড়া বাংলা দেশের জলে আরো অনেক রকম কচ্ছপ আছে। ভারতবর্ষের চেয়ে ব্রহ্মদেশে বেশি কচ্ছপ দেখা যায়।

সমুদ্রের কচ্ছপ অতি ভয়ানক জন্তু। তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতির কথা শুনিলে তোমারা অবাক্ হইবে। এখানে এক রকম সমুদ্রের কচ্ছপের ছবি দিলাম। দেখ, কি বিশ্রী চেহারা! ইহাদের এক-একটার ওজন প্রায় চারি মণ অর্থাৎ তিনটা মানুষের ওজনের সমান। সমুদ্রের লতাপাতা ইহাদের প্রধান আহার। ইহারা চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে।
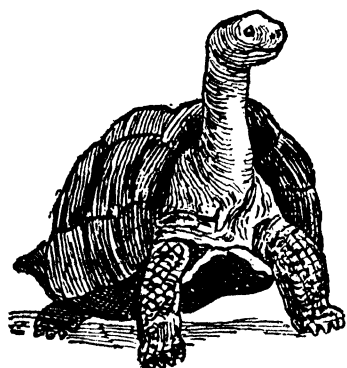
চারি মণ ওজনের কচ্ছপ

মাংস খাইতে ভালো বলিয়া, লোকে ইহাদিগকে ধরিয়া খায়।

এখানে আর এক জাতি কচ্ছপের ছবি দিলাম। ভারত মহাসাগরে ইহারা বাস করে। কি ভয়ানক চেহারা! দেখিলেই যেন ভয় লাগে। শুঁড়টা যেন বাজপাখীর ঠোঁটের মতো বাঁকানো। গায়ের উপরটা আবার ডুমো-ডুমো হাড়ে ঢাকা! মুখখানা বাজ-পাখীর মতো বলিয়া, ইহাকে বাজঠুঁটো (Hawk's Bill) কচ্ছপ বলা হয়।
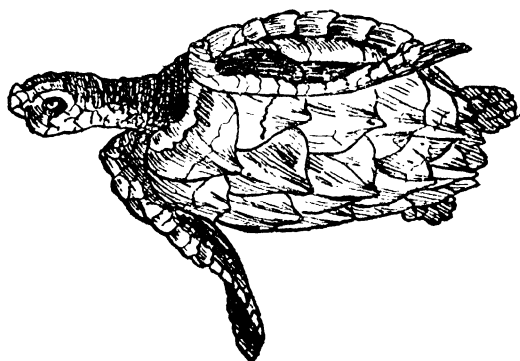
বাজঠুঁটো কচ্ছপ

এগুলি ওজনে আধ মণ পর্য্যন্ত হয়। কচ্ছপের খোলায় যে-সব চিরুণী, ছুরির বাঁট, বাক্স প্রভৃতি হয়, তাহা লোকে এই কচ্ছপের খোলা দিয়াই তৈয়ারি করে।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, সমুদ্রের এই কচ্ছপগুলিই বুঝি সকলের চেয়ে বড়; কিন্তু তাহা নয়। আমেরিকার সমুদ্রে বারো মণ ওজনেরও এক রকম কচ্ছপ আছে। ইহাদের গায়ের খোলা চামড়া দিয়া ঢাকা থাকে। ডিম প্রসবের সময় ছাড়া ইহারা কখনই ডাঙায় উঠে না। মাংস সুস্বাদু নয় বলিয়া লোকে এগুলির উপরে অত্যাচার করে না।

যাহা হউক দেখ, মানুষের হাতে এই নিরীহ জন্তুদের কত

অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। পাঁকের তলায়, মাটির নীচে এবং সমুদ্রের অগাধ জলে লুকাইয়াও ইহারা পরিত্রাণ পায় না। মানুষ অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া উহাদিগকে ধরিয়া খায় এবং দেশবিদেশে বিক্রয়ের জন্য চালান দেয়। খুব ঠাণ্ডা দেশের সমুদ্রে কচ্ছপেরা থাকিতে পারে না। এইজন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশের সমুদ্রে বেশি কচ্ছপ থাকে না। কিন্তু সে-সব দেশের লোকে কচ্ছপের মাংস খাইবার জন্য লালায়িত থাকে। তাই জাহাজ বোঝাই হইয়া হাজার হাজার কচ্ছপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে সেখানে চালান হয়। ইংলণ্ডের কোনো কোনো খানায় কচ্ছপের ঝোল না হইলে ভোজ ভালো হয় না। আমেরিকাতেও কচ্ছপের মাংসের বড় আদর।

কুমীর

কুমীর তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ হয় ত দেখিয়াছ। বাংলাদেশের অনেক নদী ও খালের জলে কুমীর থাকে। শীতের দেশে কিন্তু কুমীর দেখা যায় না। আফ্রিকা ও আমেরিকার গরম দেশে খুব বড় কুমীর থাকে।

এখানে কুমীরের একটা ছবি দিলাম। দেখ, কি বিশ্রী জানোয়ার,—যেন জলের বড় টিকৃটিকি। মাছ ব্যাঙ্ ও কচ্ছপেরা
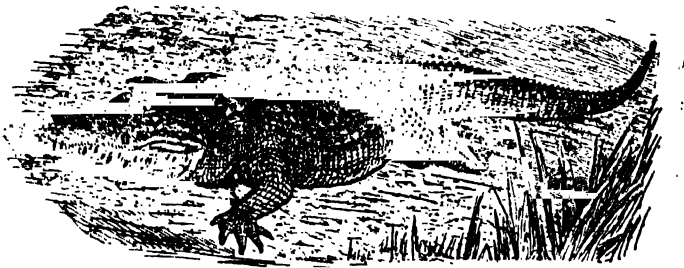
কুমীর

ইহাদের ভয়ে অস্থির থাকে। মানুষ, গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি ডাঙার প্রাণীরাও কুমীরকে ভয় করে। যে-সব নদীতে বা খালে কুমীর থাকে, ঐ-সব ডাঙার জন্তুরা জলে নামিলে কুমীরেরা তাহাদিগকে ধরিয়া খায়।

আকৃতি-প্রকৃতি ও ইন্দ্রিয়

দেখিতে টিকৃটিকির মতো হইলেও কুমীরের গায়ের চামড়া কিন্তু টিকৃটিকির মতো নয়। ইহাদের সমস্ত শরীর শক্ত

আঁশওয়ালা চামড়ায় ঢাকা থাকে। কিন্তু আঁশগুলি মাছের আঁশের মতো নয়। পিঠের উপরে যে আঁশ থাকে, সেগুলি চৌকোণা এবং হাড়ের মতো শক্ত। এই-রকমে গা ঢাকা থাকে বলিয়াই তরোয়াল বা বর্শার সামান্য আঘাতে কুমীরদের মারা যায় না। বন্দুকের গুলি যদি টের্‌চাভাবে কুমীরের গায়ে লাগে, তবে ঐ শক্ত ছাল ছিঁড়িয়া গুলি শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। তাই কুমীর শিকার করা খুব শক্ত।

কচ্ছপের পাঁজরার হাড় একত্র হইয়া পিঠের খোলা তৈয়ারি হয়। কিন্তু কুমীরের তাহা দেখা যায় না! ইহাদের পাঁজরের হাড়, বুক্কাস্থি অর্থাৎ বুকের হাড়ের সঙ্গে যোগ করা থাকে।

কুমীরের মুখে দাঁত আছে। সেগুলির তলা মোটা ও গোল, কিন্তু আগাগুলি সরু এবং খুব ধারালো। মুখের দুই চোয়ালেই এ-রকম দাঁত এক সারি করিয়া লাগানো থাকে। বুড়ো মানুষের দাঁত পড়িয়া গেলে আর নূতন দাঁত গজায়না। কিন্তু বুড়ো কুমীরের গণ্ডায় গণ্ডায় দাঁত পড়িয়া গেলে, সেই সব পুরানো দাঁতের জায়গায় আবার নূতন দাঁত গজায়। বড় মজার ব্যাপার নয় কি? এইজন্য খুব বুড়ো কুমীরকেও সকলে ভয় করিয়া চলে।

লোকে বলে কুমীরের জিভ নাই, তাই তা'রা যা খায় তা'র স্বাদ জানিতে পারে না। কিন্তু একথা ঠিক্ নয়।

কুমীরের জিভ আছে, এবং তাহারা খাবারের স্বাদও বুঝিতে পারে। আমাদের জিভের মতো কুমীরের জিভ চেপ্টা কিন্তু তাহার আগাগোড়া মুখের তলায় আট্‌কানো থাকে। তাই আমাদের মতো উহারা জিভ মুখের বাহিরে আনিতে পারে না।

ছবিতে দেখ, কুমীরের মুখ কত সরু। কতকটা পাখীর ঠোঁটের মতো নয় কি? মুখের চোয়াল লম্বা হইয়া উহাদের মুখকে এই-রকম সরু করে। এই লম্বা চোয়ালেই দাঁত লাগানো থাকে। তোমরা যদি কখনো মরা কুমীর দেখিতে

মুখ

পাও, তবে তাহার নাক দুইটি কোথায় আছে পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, নাক আছে তাহাদের ছুঁচ্‌লো মুখের উপরে। কুমীরেরা নাক দিয়াই বাতাস টানে এবং তাহা ফুস্‌ফুসে লইয়া গিয়া শরীরের কাজ চালায়। তাই সব শরীর জলে ডুবাইয়া তাহারা নাক উপরে রাখিয়া ভাসিয়া বেড়ায়। ইহারা নিশ্বাস না লইয়া কখনই বেশিক্ষণ জলে ডুবিয়া মাছের মতো সাঁত্‌রাইতে পারে না।

তোমরা বোধ হয় ভাবো, কুমীরেরা যখন জলের তলায় শিকারকে হাঁ করিয়া কামড়ায়, তখন বুঝি তাহাদের পেটে জল ঢুকিয়া যায়। কিন্তু তাহা হয় না। হাঁ করিলেই কুমীরের মুখের জিভ উঁচু হইয়া গলার ছিদ্রটাকে বন্ধ করিয়া

দেয়! তাই ইহারা নিশ্চিন্ত হইয়া জলের তলায় হাঁ করিয়া বেড়াইতে পারে। কুমীরদের নাকেও ঐ-রকম কপাট লাগাইবার ব্যবস্থা আছে। জলে ডুব দিবার সময়ে উহারা নাকের ছিদ্রকে বন্ধ করিয়া দেয়, তাই নাকে জল প্রবেশ করিতে পারে না।

কুমীরের চারিখানা করিয়া খাটো-খাটো পা থাকে। তোমরা যদি আঙুল পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, উহাদের সম্মুখের পায়ে চারিটি এবং পিছনের পায়ে পাঁচটি করিয়া আঙুল আছে। পিছনের পায়ের আঙুলগুলি আবার হাঁসের আঙুলের মতো সরু চামড়ায় জোড়া। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, কুমীরেরা বুঝি পিছনের পা দিয়াই সাঁতার কাটে, কিন্তু তাহা নয়। পিছনে যে লম্বা চওড়া লেজ থাকে, তাহা নাড়িয়াই কুমীরেরা সাঁতার দেয়। এই লেজ দাঁড় ও হাল দু'য়েরই কাজ করে। পিছনের পায়ের জোড়া আঙুলগুলি কখনো কখনো দাঁড়ের কাজ চালায়।

কুমীরের গায়ের জোর অতি ভয়ানক। লেজের ঝাপটে ইহারা বড় বড় মহিষকেও জলে ফেলিয়া মারিতে পারে। কুমীরের সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়া মহিষেরা হার মানে। আমাদের সুন্দরবনে আগে বাঘে ও কুমীরে লড়াই হইয়াছে, ইহাও শুনিয়াছি। এই সকল লড়াইয়ে বাঘেরাই হার মানিয়াছে।

কিন্তু কুমীরের যত জোর জলের তলায়। আমরা ডাঙায়,

যেমন বাঘ, ভালুক ও সিংহকে ভয় করি, জলচরেরা সেই-রকমে কুমীরকেও ভয় করে। কিন্তু ডাঙায় উঠিলে তাহাদের আর সে জোর থাকে না। ডাঙায় তাহারা ছুটিয়া চলিতেও পারে না। কুমীরের পা কত ছোটো তাহা তোমরা জানো। বড় দেহকে এই ছোট পায়ের উপরে রাখিয়া তাহারা দৌড়াইতে পারে না। তাই ডাঙায় চলিবার সময় কতকটা বুকে হাঁটিয়া ইহারা ধীরে ধীরে চলে। চষা মাটির উপর দিয়া চলিবার সময়ে তাহাদের পায়ে মাটির ঢেলাগুলি ঠেকিয়া চারিদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়ে। তাই বোধ হয় লোকে বলে, ডাঙায় চলিবার সময়ে কুমীরেরা দুই ধারে ঢিল ছোঁড়ে।

কচ্ছপদেরও মতো কুমীরদেরও কতক স্ত্রী ও কতক পুরুষ হইয়া জন্মে। স্ত্রী-কুমীরেরা ডিম প্রসব করে এবং সেই-সব ডিম হইতে বাচ্চা কুমীর বাহির হয়। তোমরা বোধ হয় কুমীরের ডিম দেখ নাই। মানুষ-খেকো কুমীরদের ডিম হাঁসের ডিমের মতো বড় হয় এবং একেবারে তাহারা অনেক ডিম প্রসব করে। কিন্তু নদীর ধারে বালির ভিতরে ডিম প্রসব করার পরে, তাহারা আর সেগুলির সন্ধান লয় না। তাই শিয়াল, বেজি, কাক, চিল প্রভৃতি জন্তুরা বালি খুঁড়িয়া ডিম বাহির করে। কুমীরের ডিম যদি এই-রকমে নষ্ট না হইত, তাহা হইলে আমাদের দেশের নদী খাল বিল সকলি কুমীরে ভর্ত্তি হইয়া যাইত।

কুমীরের বিভিন্ন জাতি

তোমরা কত রকম কুমীর দেখিয়াছ জানি না। আমরা কিন্তু এই বাংলা দেশেই তিন রকম কুমীর দেখিয়াছি।

তোমরা মেছো-কুমীর দেখ নাই কি? ইহাকে আবার অনেকে ঘড়িয়ালও বলে। গঙ্গায় ও ব্রহ্মপুত্রে এই কুমীর অনেক আছে। নদী হইতে উঠিয়া ইহারা অন্য জায়গায়
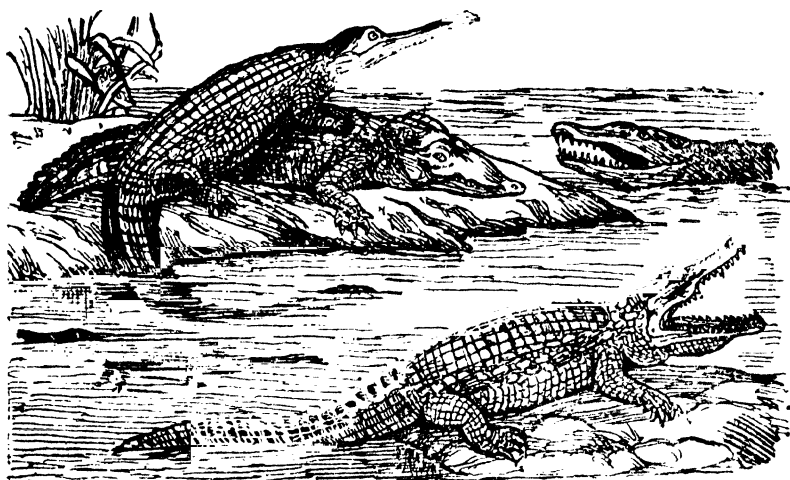
নানা জাতির কুমীর

যাইতে পারে না। এইজন্য খালে বিলে ও পুকুরে মেছো-কুমীর প্রায়ই দেখা যায় না। ইহারা মাছ বা জলের অন্য পোকা-মাকড় খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে; মানুষ বা অন্য বড় জন্তুকে হঠাৎ তাড়া করে না। মেছো-কুমীরেরা আকারে

নিতান্তই ছোটো হয় না। কোনো-কোনোটাকে দশ বারো হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইতে দেখা যায়।

পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় অনেকগুলি কুমীরের ছবি দিয়াছি। ছবির উপর দিকে যে কুমীরটি অন্য একটির ঘাড়ে চাপিয়া আছে, সেইটিই মেছো-কুমীর। দেখ, অন্য কুমীরদের চেয়ে ইহার মুখ কত লম্বা ও সরু। ঐ মুখে মাছ খাওয়ার কাজ বেশ চলে, কিন্তু মানুষ গরু ভেড়া খাওয়ার কাজ উহাতে চলে না। মেছো-কুমীরেরা লোনা জল পছন্দ করে না। তাই সুন্দরবনে বা সমুদ্রের কাছের নদীতে ইহাদিগকে দেখা যায় না।

আমাদের নদী-নালা এবং কখনো কখনো বড় দীঘিতে যে কুমীর দেখা যায়, সেগুলির মুখ মেছো-কুমীরের মুখের মতো সরু নয়। ছবির ডান ধারের কোণে যেটি মুখ হাঁ করিয়া রহিয়াছে তাহাই সেই কুমীরের ছবি। এই কুমীরকে অনেকে "মগর" বলে। আকারে এগুলি আট-দশ হাতের বেশি হয় না বটে, কিন্তু গরু ভেড়া হরিণ প্রভৃতিকে কাছে পাইলে ধরিতে ছাড়ে না এবং সুবিধা পাইলে মানুষকেও কামড়ায়। নদীর ধারে বালির উপরে ইহাদিগকে মরার মতো শুইয়া থাকিতে দেখা যায়। রোদে পিঠ দিয়া শুইয়া থাকিতে ইহারা খুব ভালবাসে। ইহাদের আকৃতি কতকটা যেন ঢেঁকির মতো। ইহারাও লোনা জল পছন্দ করে না।

আমাদের দেশের যে-সব কুমীর ষাঁড় মহিষ ও মানুষ ধরিয়া খায়, সেগুলি অতি ভয়ানক জন্তু। কখনো কখনো

তাহাদিগকে কুড়ি হাতেরও অধিক লম্বা হইতে দেখা যায়। সমুদ্র ও সমুদ্রের কাছের নদীই ইহাদের প্রধান আড্ডা। লোনা জলই ইহারা পছন্দ করে। এই কুমীরেরাই আমাদের সুন্দরবনের নদী নালা ও খালে থাকে। সুবিধা পাইলে তাহারা নৌকা হইতে মানুষকে ধরিয়া খাইয়াছে ইহাও শুনা গিয়াছে। বাঘেরা যখন নদীতে জল খাইতে আসে, তখন তাহারাও নিস্তার পায় না।

কুমীরের শিকার ধরা

কুমীররা যে-রকমে শিকার ধরে তাহা বড় মজার। নদীর যে-সব জায়গায় গরু-বাছুর জল খাইতে নামে বা লোকে স্নান করে, তাহারি কাছে উহারা কেবল মুখের আগাটা কখনো-বা মাথাটা জলের উপরে রাখিয়া ভাসিতে থাকে। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন এক টুক্‌রা কাঠ বা একটা কোনো কালো জিনিস নদীর জলে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কাছেই যে কুমীর আছে, ইহা কেহ বুঝিতেই পারে না। কিন্তু কুমীরের নজর থাকে শিকারের উপরে। তাই কোনো জন্তু-জানোয়ার জলে পা দিবামাত্র, সে ডুব-সাঁতার দিয়া ঠিক্ সেই জায়গায় আসিয়া হাজির হয় এবং তা'র পরে সে প্রকাণ্ড লেজের ঝাপ্‌টায় তাহাকে জলে ফেলিয়া কাম্‌ড়াইয়া ধরে। একবার কাম্‌ড়াইয়া ধরিলে কোনো জন্তুই রক্ষা পায় না। লেজের ঝাপটেই

শিকার জখম হয়। তা'র পরে জলে ডুবাইলে শ্বাস বন্ধ হইয়া মারা যায়।

নদীর যে-সব জায়গায় লোকজনের বেশি আনাগোনা যেখানে কুমীরেরা শিকারকে খায় না। শিকারকে মুখে করিয়া তাহারা স্নানের ঘাট হইতে দূরে বেশ নিরিবিলি জায়গায় গিয়া তাহা ধীরে-সুস্থে আহার করে।

আমরা যখন তোমাদের মতো ছোটো ছিলাম, তখন গল্প শুনিয়াছি, কুমীরেরা শিকার ধরিয়াই তাহা গিলিয়া ফেলে না। খেলা করিবার সময়ে তোমরা যেমন শূন্যে বল ছুঁড়িয়া তাহা লুফিয়া লও, কুমীরেরা সেই-রকমে দুই একবার শিকারকে শূন্যে ফেলিয়া দেয় এবং তা'র পরে মুখ দিয়া লুফিয়া লইয়া সেগুলিকে গিলিয়া ফেলে। আমাদের এক বুড়ী দাসী বলিত, কুমীরেরা বড় ধার্ম্মিক, তাই মুখের শিকার তিনবার সূর্য্যদেবকে দেখাইয়া আহার করে। তোমরা এ-রকম গল্প শুন নাই কি? গল্প হইলেও ব্যাপারটা কিন্তু সত্য। ছোটো-খাটো শিকার ধরিয়া কুমীরেরা সত্যই সে-গুলি দুই একবার শূন্যে ছুঁড়িয়া লোফালুফি করে এবং তা'র পরে মুখে পুরিয়া গিলিতে আরম্ভ করে। এই লোফালুফি করার কারণ বোধ হয় তোমরা জানো না। তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, কুমীরেরা যখন হাঁ করিয়া শিকারকে জলের তলায় চাপিয়া ধরে, তখন মুখের ভিতরে অনেক জল প্রবেশ করে। কিন্তু মুখ জলে ভরা থাকিলে অন্য কোনো জিনিস খাওয়ার সুবিধা

হয় না। 'মনে কর, তুমি যেন মুখ-খানি জলে ভরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছ। এখন যদি দুইটি রসগোল্লা আনিয়া তোমার সম্মুখে ধরা যায়, তাহা হইলে তুমি তাহা খাইতে পারিবে কি? কখনই পারিবে না। জলটুকুকে মুখ হইতে ফেলিয়া না দিলে রসগোল্লা খাইতে পারিবে না। কাজেই কিছু খাইতে গেলে কুমীরদেরও মুখের জলটুকু আগে বাহির করা দরকার হয়। কুমীরেরা শিকারগুলিকে শূন্যে ছুড়িয়া দিয়াই মুখের জল বাহির করিয়া ফেলে। তা'র পরে সেগুলিকে লুফিয়া গিলিতে সুরু করিয়া দেয়।

আমাদের বাংলা দেশে ইচ্ছমতী নদীতে অনেক কুমীর থাকে। তাই, যাহাতে কুমীরেরা মানুষ ধরিতে না পায় তাহার জন্য স্নানের ঘাটের অনেকটা দূর লম্বা বাঁশের খোঁটা দিয়া ঘিরিয়া রাখা হয়। তোমরা যদি কখনো আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখিতে যাও, তবে সেখানকার পুকুরে খুব বড় কুমীর দেখিতে পাইবে।

আমাদের দেশে গ্রামের কাছের জঙ্গলে বাঘ বাহির হইলে শিয়ালেরা দূরে থাকিয়া এক-রকম "ফেউ-ফেউ" শব্দ করে। এই শব্দ শুনিয়া গৃহস্থেরা সাবধান হয় এবং গোয়ালঘরে আসিয়া যাহাতে বাঘেরা হঠাৎ গরুবাছুর মারিতে না পারে তাহার জন্য গ্রামের লোকেরা আগুন জ্বালে। দিনের বেলায় গর্ত্ত হইতে সাপ বাহির হইলেই শালিক ও ফিঙে পাখীর দল সাপের মাথার উপরে উড়িতে উড়িতে

ভয়ানক "ক্যাঁ ক্যাঁ" শব্দ করে। তোমরা ইহা দেখ নাই কি? জঙ্গলের কাছে পাখীর এই-রকম চীৎকার শুনিয়া আমরা সেখানে গিয়া অনেক বার সাপ দেখিয়াছি। শিয়ালের দল কেন বাঘের পিছনে থাকিয়া চীৎকার করে এবং পাখীর দলই বা কেন সাপ দেখিলে চেঁচামেচি সুরু করে, তাহা জানি না। কিন্তু এই-রকম চীৎকারে অন্য প্রাণীরা সাবধান হয়। কুমীরেরা কি-রকম ফন্দিতে মানুষ গরু প্রভৃতি শিকার করে তাহা তোমাদিগকে বলিয়াছি। যখন জলের উপরে মুখটি রাখিয়া তাহারা শিকারের জন্য ভাসিতে থাকে, তখন এক-রকম পাখীকে উহাদের মাথার উপরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চীৎকার করিতে দেখা যায়। এই চীৎকার শুনিয়া লোকে সাবধান হয়।

দেখ, যাহারা দুর্ব্বল তাহাদিগকে বলশালীর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ কেমন সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

টিক্‌টিকি ও গিরগিটি

সরীসৃপদের মধ্যে কচ্ছপ ও কুমীরদের কথা বলিলাম। এখন তোমাদিকে টিক্‌টিকি ও গিরগিটিদের কথা বলিব। কিন্তু সকলের কথা বলা হইবে না। আমাদের দেশে ইহাদের তিনটি জাতি আছে এবং তিন জাতিতে দুই শত রকমের ছোটো-বড় নানা রকমের টিক্‌টিকি ও গিরগিটি দেখা যায়। এ-গুলির মধ্যে আবার অনেকেই বনে-জঙ্গলে, নদীর ধারে বা জলে বাস করে। কাজেই সকলগুলির বিবরণ দিতে গেলে একখানা প্রকাণ্ড বই হইয়া দাঁড়াইবে। এই বর্গের প্রাণীর আমরা কেবল মোটামুটি পরিচয় দিব।

আকৃতি-প্রকৃতি

টিক্‌টিকি ও গিরগিটিদের চারিখানা করিয়া পা এবং একটা করিয়া লেজ থাকে। চোখ কান নাক ও শ্বাসযন্ত্র প্রায় কুমীরদেরই মতো। আবার কয়েকজাতি গিরগিটির শরীরে পা দেখা যায় না; খুঁজিলে কেবল চারিখানি পায়ের অঙ্কুর মাত্র নজরে পড়ে।

টিক্‌টিকি প্রভৃতির লেজ বড় মজার জিনিস। একটু আঘাত লাগিলেই সেগুলি খসিয়া পড়ে। টিক্‌টিকির এই-রকম লেজ খসিয়া পড়ে তোমরা দেখ নাই কি? কুকুর বিড়াল

বা অন্য জানোয়ারের লেজ কাটিয়া দিলে তাহা আর গজায় না। কিন্তু টিক্‌টিকির লেজ খসিয়া পড়িলে তাহারা বেশি দিন লেজহীন হইয়া থাকে না। কিছুদিন পরেই দেখা যায় তাহাদের নূতন লেজ গজাইতেছে! মজার ব্যাপার নয় কি? কুকুর বিড়াল গরু ছাগল সকল জন্তুরই লেজে হাড় থাকে। সেগুলি মেরুদণ্ডেরই হাড়। টিক্‌টিকিদেরও লেজে মেরুদণ্ডের হাড় থাকে। কিন্তু লেজ ভাঙিয়া গেলে যে নূতন লেজ বাহির হয়, তাহাতে মোটেই হাড় থাকে না। তাহা হইলে বলিতে হয়, গায়ের মাংসই লম্বা হইয়া ইহাদের নূতন লেজের সৃষ্টি করে। গিরগিটির গায়ে খুব ছোটো-ছোটো আঁশ থাকে।

অন্য সরীসৃপদের মতো এই বর্গের জন্তুরা ছোটো ডিম প্রসব করে এবং সেই সকল ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হয়। টিক্‌টিকির ডিম তোমরা দেখ নাই কি? দেখিলে মনে হয় সেগুলি বুঝি সাদা মটর। হাঁসের ডিমের খোলা যেমন পুরু টিক্‌টিকির ডিমের খোলা সে-রকম নয়। ইহাদের খোলা কাগজের মতো পাত্‌লা।

কুমীরের মতো চেহারা হইলেও টিক্‌টিকি ও গিরগিটিরা উহাদের মতো রাক্ষুসে প্রাণী নয়। ছোট পোকা-মাকড়ই ইহাদের প্রধান খাদ্য। আবার যাহারা পোকা-মাকড় পছন্দ করে না, এ-রকম গিরগিটিও অনেক আছে। ইহারা কচি পাতা পচা গাছপালা খাইতে ভালবাসে।

টিক্‌টিকি

এখানে টিক্‌টিকির একটা ছবি দিলাম। তোমাদের ঘরেই হয়ত অনেক টিক্‌টিকি আছে। কি বিশ্রী চেহারা গায়ে লাফাইয়া পড়িলে ভয় করে। কিন্তু ইহারা অতি নিরীহ প্রাণী,

টিক্‌টিকি

বিছে বা সাপের মতো কামড়ায় না। ইহাদের গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা, তাই টিক্‌টিকি গায়ে ঠেকিলেই ঠাণ্ডা বলিয়া বোধ হয় এবং গা ঘিন্‌ঘিন্ করিয়া উঠে।

যে-সব জায়গায় সর্ব্বদা লোক আনাগোনা করে সেখানে দিনের বেলায় প্রায়ই টিক্‌টিকি দেখা যায় না। সন্ধ্যার সময়ে ঘরে আলো জ্বালিলে তোমরা ইহাদিগকে দেওয়ালের গায়ে বেড়াইতে দেখিতে পাইবে। তাহা হইলে বলিতে হয়, টিক্‌টিকিরা নিশাচর জন্তু। সত্যই তাই। দিনের বেলায় উহারা কপাটের আড়ালে চুপ করিয়া লুকাইয়া থাকে। তা'র

পরে যেই সন্ধ্যা হয়, অমনি সেই-সব জায়গা হইতে বাহির হইয়া তাহারা টিক্‌টিক্ শব্দ করিতে থাকে।

টিক্‌টিকির গায়ের রঙ্ কি-রকম, তাহা তোমাদিগকে বলিতে পারিব না। ঘোলাটে সাদা রঙের টিক্‌টিকি প্রায়ই দেখা যায়। আবার প্রায় কালো রঙের টিক্‌টিকিও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। গায়ের ছিটাফোঁটা-দেওয়া এবং গায়ের ছাল অসমান, এ-রকম টিক্‌টিকিও আমরা অনেক দেখিয়াছি। ময়লামাটি ও আবর্জ্জনার মধ্যে যে-সব ব্যাঙ্ থাকে, তাহাদের গায়ের রঙ্ কালো হয়, ইহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। টিক্‌টিকিদের মধ্যেও অনেক সময়ে তাহাই দেখা যায়। ইহারা যে জায়গায় বাস করে গায়ের রঙ্ প্রায়ই সেই জায়গার মতো হয়। এই বর্গের অন্য প্রাণীদের মতো টিক্‌টিকিদের সমস্ত গায়ে আঁশ লাগানো দেখা যায় না। তোমরা যদি পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, ইহাদের পিঠে অর্থাৎ ঠিক মেরুদণ্ডের উপরে একসারি আঁশ লাগানো আছে।

সাপেরা গায়ের খোলস ছাড়ে। টিক্‌টিকিদের তোমরা খোলস ছাড়িতে দেখিয়াছ কি? আমরা ইহা অনেকবার দেখিয়াছি। খোলস ছাড়ার সময় হইলে টিক্‌টিকিদের গায়ের ছাল আপনা হইতেই আল্‌গা হইয়া যায়। তখন মুখ দিয়া ধরিয়া সেই ছাল তাহারা গা হইতে খসাইয়া দেয়। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, গায়ের ছাল খুলিয়া তাহারা ফেলিয়া দেয়। কিন্তু তাহা করে না— নিজেদের গায়ের ছাল তাহারা নিজেরাই খাইয়া ফেলে। এই-

রকমে নিজেদের গায়ের ছাল খাইতে তাহাদের একটুও ঘৃণা বোধ হয় না।

আমরা যেমন মাটির উপর দিয়া দৌড়াইয়া বেড়াই; টিক্‌টিকিরা সেই-রকমে দেওয়ালের গায়ে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। ইঁদুর বা ব্যাঙ্ দেওয়াল বহিয়া উপরে উঠিতে গেলে ধপাস্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। কিন্তু টিক্‌টিকিরা পড়ে না। ইহারা কেমন করিয়া দেওয়ালের গায়ে পা আট্‌কাইয়া চলা-ফেরা করে, তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। টিক্‌টিকিদের পায়ের প্রত্যেক আঙুলের তলায় কতকটা যেন পেয়ালার মতো এক-একটা থলি আছে। আঙুলে চাপ দিলে সেই-সব থলি হইতে যেমনি বাতাস বাহির হয়, অমনি আঙুলগুলি দেওয়ালের গায়ে আট্‌কাইয়া যায়। এই-রকমে আঙুলগুলিকে আট্‌কাইতে আট্‌কাইতে ইহারা দেওয়ালের গায়ে চলা-ফেরা করে।

আমাদের ঘরের এবং কখনো বনজঙ্গলের গাছের ডালে ছোটো-বড় অনেক টিক্‌টিকি দেখা যায়। "জাহাজে"-টিক্‌টিকি তোমরা দেখিয়াছ কি? এগুলি কখনো কখনো দশ আঙুল পর্য্যন্ত লম্বা হয়। খোঁজ করিলে তোমরা হয় ত তোমাদের ঘরেই এই টিক্‌টিকি দেখিতে পাইবে। হয় ত কোনো সময় ইহারা বিদেশ হইতে আসিয়া আমাদের ঘরে আশ্রয় লইয়াছিল, তাই ইহাদের নাম হইয়াছে "জাহাজে"-টিক্‌টিকি। কিন্তু সকলের চেয়ে বড় টিক্‌টিকি দেখা যায়

পূর্ব্ববঙ্গে। এগুলিকে এক ফুট্ পর্য্যন্ত লম্বা হইতে দেখা যায়। পূর্ব্ববঙ্গের লোকে ইহাকে "তক্ষক" বলে্। ইহারা প্রায়ই বনে-জঙ্গলে বাস করে। সেখানে খাবারের অভাব হইলে লোকের বাড়ীতে আসিয়া খাবারের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়।

গো-সাপ

গো-সাপ হয় ত তোমরা কেহ কেহ দেখিয়াছ। নাম গো-সাপ হইলেও ইহারা কিন্তু সাপ নয়। ইহারা সরীসৃপ শ্রেণীরই জন্তু। ভালো কথায় ইহাদের নাম গোধা। আমাদের বাংলা দেশে ছোটো-বড় নানা উপজাতির গো-সাপ আছে। পূর্ব্ববঙ্গে ও সুন্দর-বনে চারিহাত লম্বা গো-সাপও দেখা যায়।

গো-সাপরা জলের ধারে বাস করিতে ভালবাসে। কখনো কখনো জলে নামিয়া জলের পোকা-মাকড় খাইয়া বেড়ায়। ইহাদের মধ্যে যেগুলি বড়, তাহারা গৃহস্থের হাঁস ও মুরগী ধরিয়া খাইয়াছে, ইহাও শুনিয়াছি। গো-সাপরা কোথায় থাকে, তাহা বোধ করি তোমরা জানো না। মাঠের বড় বড় ইঁদুরের মতো ইহারা বনজঙ্গলের মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতেই বাস করে এবং সেখানেই ডিম পাড়ে। আমাদের দেশের ইতর লোকে গো-সাপ মারিয়া খায় এবং তাহাদের চামড়ায় খঞ্জনি ও সারিন্দা তৈয়ারি করে। তাই যেখানে মানুষের আনাগোনা নাই, এমনি নিরিবিলি জায়গায় তাহারা লুকাইয়া থাকে।

গো-সাঁপের ডাক্ তোমরা শুন নাই কি? দূর হইতে শুনিলে মনে হয় কে যেন হুলু দিতেছে। খুব গরমের দিনে দুপুর বেলায় জঙ্গলে ইহাদের হুলুর শব্দ শুনা যায়। তাই লোকে বলে গো-সাপে হুলু দিলে শীঘ্র বৃষ্টি হয়। গো-সাপের গায়ের রঙ্ কতকটা মাটির রঙের মত দেখায়। আবার হল্‌দে রঙেরও গো-সাপ আছে। ইহাদিগকে লোকে স্বর্ণ-গোধিকা অর্থাৎ সোণা-গো-সাপ বলে।

ফেউটি

ফেউটি তোমরা দেখিয়াছ কি? পর পৃষ্ঠায় তাহার একটা ছবি দিলাম। চেহারা-খানা কিন্তু মোটেই ভালো নয়। মস্ত লেজ মুখটাও প্রকাণ্ড। পিঠের শিরদাঁড়ার উপরে আবার করাতের দাঁতের মতো আঁশ লাগানো থাকে। কাহারো কাহারো ঘাড়ের উপরে ও গলার চারিদিকেও উঁচু আঁশ থাকে।

ফেউটিরা ঝোপ-জঙ্গলে বাস করে এবং মশা মাছি ও ফড়িং খাইবার জন্য প্রায়ই গাছের ডালে ডালে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। ছোটো পোকা-মাকড় ছাড়া ইহারা অন্য খাবার পছন্দ করে না। টিক্‌টিকিদের মতোই ইহারা ডিম পাড়ে এবং সেই-সব ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হয়।

আমাদের দেশে নানা রঙের ফেউটি দেখিতে পাওয়া যায়। তোমরা গায়ের রঙ্ ইচ্ছা করিলে বদ্‌লাইতে পার না। যে কালো সে চিরজীবন কালো থাকে এবং যে ফর্সা সে সমস্ত জীবনই ফর্সা থাকে। কিন্তু আমাদের দেশেরই দুই

এক জাতি ফেউটি গায়ের রঙ্ বদ্‌লাইতে পারে। এখন যাহার গায়ের রঙ্ মাটির মতো ধূসর দেখিতেছ, একটু পরে সে হয় ত সবুজ হইয়া দাঁড়াইবে। লোকে ইহাদিগকে বহুরূপী বলে। কিন্তু তাহা ঠিক্ নয়। বহুরূপী (Chameleon) আমাদের দেশে নাই। দুই-এক উপজাতির ফেউটিদেরই গায়ের রঙ্ বদ্‌লাইবার শক্তি আছে।
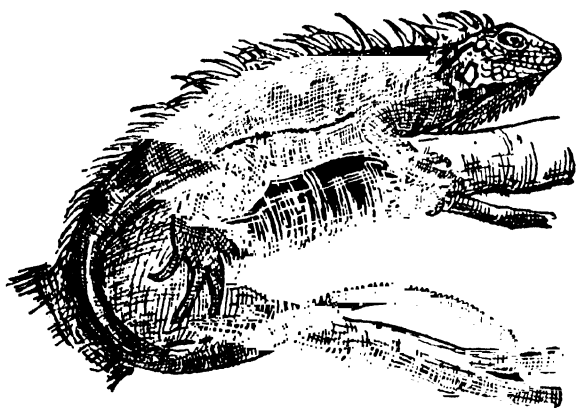
ফেউটি

মুখের খানিকটা ও গলা লাল, এ-রকম ফেউটি তোমরা দেখ নাই কি? সাধারণ লোকে এগুলিকে বড় ভয় করে। তাহারা বলে, এই লাল ফেউটিরা নাকি মানুষের রক্ত চুষিয়া খায়। এইজন্য পূর্ব্ববঙ্গের ও মান্দ্রাজের লোকে ইহাদিগকে "রক্ত চোষা" বলে। কিন্তু ইহারা মানুষের বা অন্য কোনো জন্তুর রক্ত চুষিয়া খায় না। ঝোপে ও জঙ্গলে যে-সব পোকা-মাকড় থাকে, তাহা শিকার করিয়াই ইহারা পেট ভরায়।

"রক্ত-চোষা" ফেউটির গলায় ও মাথায় তোমরা যে লাল রঙ্ দেখিতে পাও তাহা স্থায়ী রঙ্ নয়। যখন উহাদের ডিম পাড়িবার সময় হয়, তখম পুরুষ-ফেউটিদেরই গায়ে ঐ-রকম রঙ্ হয়। পরে সে রঙ্ আর থাকে না।

আজ্‌নাই

তোমরা আজ্‌নাই নিশ্চয়ই দেখিয়াছ; ইহারাও টিক্‌টিকি ও গিরগিটি বর্গের প্রাণী। ইহারা পাঁচ বা ছয় ইঞ্চির বেশি লম্বা হয় না। পা চারিখানি এত ছোটো যে নজরেই পড়ে না। তাই হঠাৎ দেখিলে উহাদিগকে সাপ বলিয়াই মনে হয়।
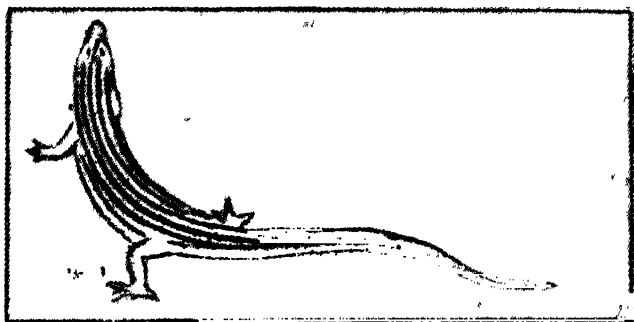
আজ্‌নাই

আজ্‌নাইয়ের গায়ে খুব ছোটো চক্‌চকে আঁশ লাগানো থাকে। সেগুলির উপরে যখন সূর্য্যের আলো পড়ে, তখন বেশ সুন্দর দেখায়।

আজ্‌নাইরা কখনোই টিক্‌টিকির মতো দেওয়ালের গায়ে উঠে না,—প্রায়ই মাটির উপর দিয়া চলা-ফেরা করে। বাড়ীর যেখানে

ময়লামাটি জড় করা থাকে, ইহাদিগকে প্রায়ই তাহারি মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে দেখা যায়। ছোটো পোকা-মাকড় ইহাদের প্রধান খাদ্য।

আজ্‌নাইরা মানুষের কোনো অনিষ্ট করে না, তবুও তাহাদিগকে দেখিলে যেন ভয় করে। অন্য সরীসৃপদের মতো ইহাদের গা খুব ঠাণ্ডা। তাহা হঠাৎ গায়ে লাফাইয়া পড়িলে বড় ভয় হয়।

বহুরূপী

আমরা আগেই বলিয়াছি যে-সব ফেউটিদের বহুরূপী বলা হয়, সেগুলিকে বাংলা দেশে দেখা যায় না। কিন্তু ব্রহ্ম-দেশের বনে-জঙ্গলে বহুরূপীর সন্ধান পাওয়া যায়। আফ্রিকাতে নানা উপজাতির বহুরূপী আছে। যাহা হউক, ইহারা বড় মজার জন্তু।
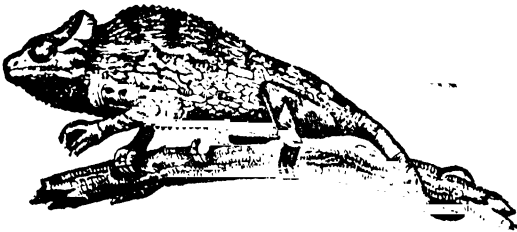
বহুরূপী

এখানে বহুরূপীর একটা ছবি দিলাম। সাধারণ ফেউটির চেয়ে ইহাদের চেহারা আরো বিশ্রী নয় কি? শরীরটার

দুই পাশ চেপ্‌টা, আবার মাথার খানিকটা মাংস যেন টোপরের মতো হইয়া রহিয়াছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন বহুরূপীর চোখ নাই। কিন্তু চোখ আছে; তাহা সরু চামড়ার পর্দ্দায় ঢাকা থাকে বলিয়াই মনে হয় বুঝি চোখ নাই। এই পর্দ্দায় যে একটু ছোটো ছিদ্র থাকে, তাহার ভিতর দিয়াই তাহারা চারিদিকের জিনিসপত্র দেখিয়া লয়। আবার দেখ, লেজটাও যেন কিম্ভূতকিমাকার—দেহের চেয়ে লেজটাই বড়। টিক্‌টিকির লেজ খসিয়া গেলে নূতন বাহির হয়; কিন্তু বহুরূপীর লেজ সে-রকম গজাইতে দেখা যায় না। ইহারা বড় সাবধানী জন্তু; পাছে গাছ হইতে পড়িয়া যায় এই ভয়ে তাহারা লেজ দিয়া গাছের ডাল জড়াইয়া ধীরে ধীরে উঠা-নামা করে। তাই এক হাত ছোটো ডালে উঠিতে ইহাদের একটা দিনই কাটিয়া যায়।

অন্য ফেউটিদের মতো বহুরূপীরা পোকা-মাকড় খাইতেই পছন্দ করে। কিন্তু এক হাত তফাতের মাছিটিকে যে তাড়াতাড়ি ধরিয়া খাইবে, এমন শক্তি তাহাদের নাই। ডাল হইতে লেজ খুলিয়া একটা পা উঁচু করিতেই তাহার এক ঘণ্টা কাটিয়া যায়,—কাজেই মাছি শিকার করা হয় না। যে-সব পোকা প্রায় মুখের কাছে আসে, বহুরূপীরা লম্বা জিভ বাহির করিয়া কেবল তাহাদেরি ধরিয়া খাইতে পারে। কিন্তু পোকা-মাকড়রা সহজে অত বড় জন্তুর মুখের কাছে আসিতে চায় না। এই জন্য বহুরূপীদের প্রায়ই উপবাসে কাটাইতে হয়।

আকৃতি-প্রকৃতি অদ্ভুত হইলেও বহুরূপীর গায়ের রঙ্ বদ্‌লানো বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিছুক্ষণ কাছে থাকিয়া লক্ষ্য করিলে মনে হয়, বহুরূপীর গায়ের উপর দিয়া যেন নানা রঙের ঢেউ চলিয়া যাইতেছে। এখন যাহার রঙ্ ধূসর দেখিতেছ, একটু পরেই দেখিবে, সে হল্‌দের উপরে ছিটাফোঁটা দেওয়া যেন আর একটা জন্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তা'র পরে হয় ত দেখিবে, সেই রঙ্‌ই ক্রমে মিলাইয়া তাহার সমস্ত গা নূতন ঘাসের মতো সুন্দর সবুজ রঙে ভরিয়া উঠিয়াছে। এই-রকমে ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের গায়ে যে কত রঙ্ প্রকাশ পায়, তাহার সীমাই হয় না।

বহুরূপীরা কি-রকমে গায়ের রঙ্ বদ্‌লায় বোধ করি তোমরা তাহা জানো না। উভচর এবং কয়েক জাতি সরীসৃপের ছালের কোষে লাল কালো সোণালি হল্‌দে প্রভৃতি নানা রঙের কণা জমা থাকে; এগুলিকে বর্ণকোষ (Chromotophore) বলা হয়। মাছ ধরিবার জালকে জেলেরা যেমন গুটাইয়া রাখে, নানা-রঙে-ভরা কোষগুলিও যেন সেই-রকমে ছালের মধ্যে গুটানো থাকে। তা'র পরে সেই সব কোষ যখন কোনো কারণে ছালের উপরে ছড়াইয়া পড়ে, তখনি সেখানে নানা রঙের প্রকাশ আরম্ভ হয়। কেমন করিয়া বর্ণকোষগুলি ছালের উপরে ছড়াইয়া পড়ে, তাহা তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে না। এখন এইটুকু জানিয়া রাখ যে, যখন রৌদ্রের তাপ বা আলো গায়ে পড়ে বা

যখন ঐ-সব প্রাণীরা রাগিয়া উঠে বা ভয় পায়, তখনি ঐ কোষগুলি গায়ে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহাতেই গায়ে নানা রঙ্‌ প্রকাশ পায়।

তাহা হইলে দেখ, বহুরূপীর গায়ের রঙ্‌ ক্ষণে ক্ষণে বদ্‌লাইতে দেখিয়া অবাক্‌ হইবার কিছু নাই। ভয় পাইলে আমাদের চোখ মুখ সাদা হইয়া যায়; আবার বেশি রাগিলে মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠে। বহুরূপীর গায়ের রঙ্‌ বদ্‌লানো কতকটা সেই-রকমেরই ব্যাপার।

যাহা হউক এই বর্গের সরীসৃপরা বড় নিরীহ প্রাণী। ইহারা মানুষের একটুও অপকার করে না, বরং উপকারই করে। ঘরে পিঁপ্‌ড়ে মাছি ও মশারা কি-রকম উৎপাত করে তোমরা দেখ নাই কি? পিঁপ্‌ড়ের জ্বালায় কখনো কখনো ঘরে মিষ্টি রাখা দায় হয়। খাইতে বসিলে মাছিরা খাবারের উপরে বসিতে চায়। গরমের দিনে দুপুরে একটু ঘুমাইতে গেলে ইহারা মুখে-চোখে বসিয়া এমন সুড়সুড়ি দেয় যে, তখন দেশের সমস্ত মাছিকে মারিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়। মশাগুলা যে কি উৎপাত করে, তাহা তোমরা সকলেই জানো,—রাত্রিতে তাহাদের কামড়ে ও ভন্‌ভনানিতে ঘুম হয় না। আমাদের ঘরে যে-সব টিক্‌টিকি থাকে, তাহারা সুবিধা পাইলেই মশা মাছি পিঁপ্‌ড়েদের ধরিয়া খাইয়া ফেলে।

সাঁপ

ভারতবর্ষকে যদি সাপের দেশ বলা যায়, তবে বোধ করি বেশ ভুল হয় না। পৃথিবীতে যত জাতির সাপ আছে, তাহাদের সকলকেই এই ভারতবর্ষে দেখা যায়। মানুষ-খেকো কুমীরেরা আমাদের অনেক অনিষ্ট করে, কিন্তু তা'র চেয়ে বেশি অনিষ্ট করে সাপেরা। আমাদের দেশের প্রায় কুড়ি হাজার লোক প্রতি-বৎসরেই সাপের কামড়ে মারা যায়। তাহা হইলে বলিতে হয়, সরীসৃপদের মধ্যে সাপই আমাদের বেশি অনিষ্ট করে। কিন্তু সাপেরা যে আমাদের উপকার করে না, একথাও বলা যায় না। হেলে, লাউডগা, ঢাড়স প্রভৃতি সাপের বিষ নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ ফসলের ক্ষেতের বড় বড় ইঁদুর, কেহ-বা বাগানের গাছের পোকা-মাকড় খাইয়া আমাদের বড় উপকার করে।

সাপের আকৃতি-প্রকৃতি

সাপ তোমরা সকলেই দেখিয়াছ এবং তাহাদের চেহারাটা যে কি-রকম তাহাও তোমরা জানো। তবুও পর পৃষ্ঠায় সাপের একটা ছবি দিলাম। দেখ, শরীরটা কত লম্বা ও গোল। ঠিক্ মোটা দড়ার মতো নয় কি? কিন্তু শরীরের পিছনের দিক্‌টা সরু। ইহাদের শরীরের কোথায় মুণ্ড শেষ হইয়া ধড় আরম্ভ হইয়াছে

এবং কোথায়ই বা ধড় শেষ হইয়া লেজ সুরু হইয়াছে, তাহা ঠিক্ বলা যায় না।

সাপ

সাপের গা খুব ছোটো আঁশে ঢাকা থাকে। যদি কখনো মরা সাপ কাছে পাও লক্ষ্য করিয়ো। দেখিবে, যেমন টালির ঘরের ছাদে টালি বসানো থাকে, সেই-রকমে আঁশগুলি একটার উপরে আর একটা সাজানো আছে। আবার কোনো কোনো সাপের গায়ে-গায়ে লাগানো আঁশও দেখা যায়। কিন্তু সাপের মাথার আঁশ গায়ের আঁশের মতো নয়। সেগুলি আকারে বড় এবং পরস্পর গায়ে-গায়ে লাগানো থাকে। শরীরে কি-রকম ভাবে আঁশ সাজানো আছে, তাহা দেখিয়া সাপদের জাতি ঠিক্ করা হয়। যাহা হউক, হেলে, লাউডগা, চিতি প্রভৃতি সাপের গায়ে তোমরা যে সুন্দর রঙ্ দেখিতে পাও, তাহা ঐ আঁশেরই রঙ্। উহাদের গায়ের ছালের বিশেষ রঙ্ নাই। তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছ, সাপের ছালের উপরে বুঝি কেবল আঁশই আছে। কিন্তু তাহা নয়। আমরা যেমন 'পালিশ-করা ভালো বাক্স বা আস্‌বাব-পত্রকে কাপড়' দিয়া ঢাকিয়া রাখি, সাপদের গায়ের চক্‌চকে আঁশ সেই-রকম পাত্‌লা

চামড়া দিয়া ঢাকা থাকে। তোমরা সাপের গায়ের এই চামড়া দেখ নাই কি? এই চামড়াই খোলসের আকারে সাপের গা হইতে মাঝে মাঝে খসিয়া পড়ে। চামড়া পুরানো হইলে যখন তাহার নীচে নূতন চামড়া জন্মে, তখনি সেই পুরানো চামড়া খসিয়া যায়। ইহাকেই আমরা সাপের খোলস বলি। খোলসে সাপের গায়ের আঁশের ছাপগুলি অতি সুন্দর দেখা যায়। যদি কোনো
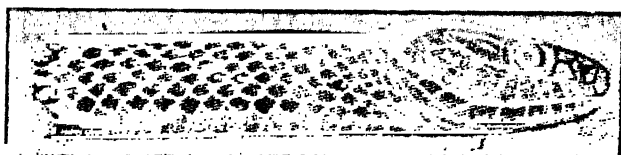
সাপের পিঠ
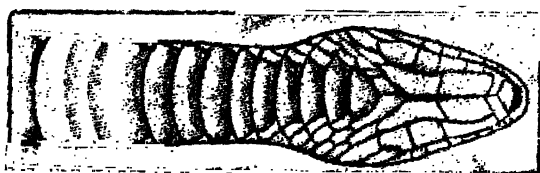
সাপের পিঠের তলা

সাপের একটা ভালো খোলস পাও, তবে দেখিবে, তাহাতে চোখ মুখ নাক প্রভৃতি ছাপ দেওয়া আছে। তাই খোলস পরীক্ষা করিলে, তাহা কোন্ জাতি সাপের গায়ে ছিল বলা যায়। আমরা একবার গোক্ষুরা সাপের খোলস দেখিয়া ছিলাম, তাহাতে ফণার উপরকার চক্রের দাগটি পর্য্যন্ত ছিল। মরা সাপের পেটের তলাকার আঁশ তোমরা দেখিয়াছ কি? সেগুলি

গায়ের উপরকার আঁশের মতো ছোটো নয়। বেশ চওড়া এক সারি আঁশ ইহার মলদ্বারের কাছ হইতে গলা পর্য্যন্ত সাজানো দেখা যায়। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় একটা সাপের পিঠের ও পেটের তলার ছবি দিলাম। দেখ, পিঠের আঁশ কত ছোটো এবং পেটের আঁশ কত বড়। পেটের তলার আঁশ সাপদের বুকে হাঁটিবার সাহায্য করে।

মানুষের মেরুদণ্ডে কেবল তেত্রিশখানি গোটা-গোটা হাড় জোড়া থাকে, কিন্তু সাপদের মেরুদণ্ডের হাড়ের সংখ্যা কখনো কখনো চারিশত পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়।

এখানে সাপের কঙ্কাল অর্থাৎ কেবল হাড়-ওয়ালা দেহের একটা ছবি দিলাম। দেখ, মুখের নীচ হইতে লেজ পর্য্যন্ত যে মেরুদণ্ড আছে, তাহাতে কত হাড় সাজানো রহিয়াছে। আবার দেখ, প্রত্যেক হাড় হইতে দুই পাশে কাঁটার মতো পাঁজরার হাড় বাহির হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর পাঁজরার হাড় যেমন বুকের হাড়ের সঙ্গে আট্কানো থাকে
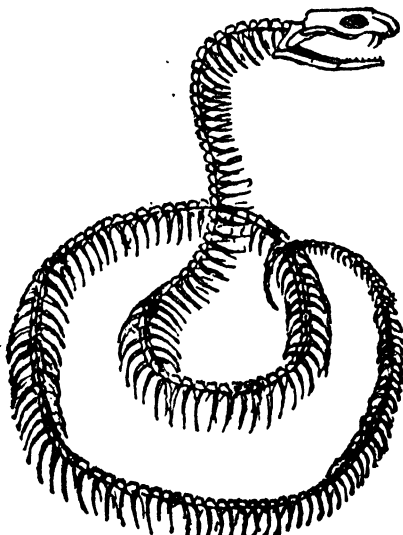
সাপের কঙ্কাল

সাপদের তাহা থাকে না। ইহাদের বুকের হাড় নাই। তাই পাঁজরার হাড়গুলি পেটের তলার আঁশের সঙ্গে জোড়া থাকে। চলিবার সময়ে সাপেরা পাঁজরার হাড়ের উপরে ভর দেয়, কাজেই ইহাতে পেটের তলায় আঁশ উঁচু হইয়া উঠে। তা'র পরে সেই আঁশগুলি দিয়া মাটি আঁক্‌ড়াইতে আঁক্‌ড়াইতে সাপেরা সম্মুখে চলিতে থাকে।

বিড়ালেরা কি-রকমে গাছে উঠে তোমরা দেখ নাই কি? ইহারা সম্মুখের পায়ের থাবা হইতে নখ বাহির করিয়া সেগুলিকে গাছের ছালে আট্‌কাইরা দেয়। তা'র পরে সেই নখের উপরে ভর রাখিয়া শরীরটাকে উপরের দিকে টানিতে থাকে। ইহাতেই বিড়ালেরা গাছে উঠিতে পারে। সাপদের চলিয়া বেড়ানো কতকটা যেন সেই-রকমের। উহাদের হাত নাই, পা নাই। তাই উহারা পেটের তলার আঁশগুলিকে পাঁজরার হাড়ের চাপে উঁচু করে এবং তা'র পরে তাহারি দ্বারা মাটি আঁক্‌ড়াইয়া সম্মুখে চলিতে থাকে। তাহা হইলে দেখ, যেখানে কোনো-কিছুকে আঁক্‌ড়াইবার সুবিধা নাই, সেখানে সাপদের চলা-ফেরা করা অসম্ভব। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহারা সত্যই খুব তেলা জায়গার উপর দিয়া চলিতে পারে না। কাচের উপরে বা খুব পালিশ করা মার্ব্বেল পাথরের উপরে সাপেরা লেজ নাড়িবে এবং ফোঁস্‌ফাঁস্‌ শব্দও করিবে, কিন্তু চলিতে কষ্ট বোধ করিবে।

সাপদের চোখের দিকে তোমরা তাকাইয়া দেখিয়াছ কি?

ইহারা একদৃষ্টিতে চোখ খুলিয়া তাকাইতে থাকে,—চোখের পলক পড়ে না। সাপের চোখে দু'খানা পাতা আছে বটে, কিন্তু তাহা পরস্পর জোড়া লাগিয়া চোখগুলিকে ঢাকিয়া রাখে। এই পাতা কাচের মতো স্বচ্ছ, তাই উহার ভিতর দিয়া সাপেরা বাহিরের সব জিনিস দেখিতে পায়। চোখের পাতা জোড়া বলিয়াই সাপেরা পলক ফেলিতে পারে না এবং চোখ বুঁজিতেও পারে না। তাহা হইলে দেখ, মাছদের মতো সাপেরাও দিবারাত্রি চোখ খুলিয়া রাখে। ঘুমাইবার সময়েও উহারা চোখ খুলিয়া ঘুমায়। সাপেরা যখন খোলস ছাড়ে, তখন তাহারা কয়েক দিন ভালো করিয়া দেখিতে পারে না।

সাপের খোলস-ছাড়া বড় মজার ব্যাপার। লোকে বলে, তাহারা বৎসরে একবার করিয়া খোলস ছাড়ে। কিন্তু তাহা ঠিক্ নয়। অনেক সাপকে বৎসরে দুই তিন বারও খোলস ছাড়িতে দেখা গিয়াছে। যাহা হউক, খোলস ছাড়িবার সময় আসিলে সাপদের আর সে-রকম স্ফূর্ত্তি থাকে না। সে সময়ে তাহারা যেন জড়ের মতো পড়িয়া থাকে। ডগ্‌ডগে চোখ দু'টিও যেন কেমন ঘোলা হইয়া আসে। ইহার দুই একদিন পরেই তাহাদের মাথার উপরকার খোলসটা খুলিয়া যায়। তখন সাপেরা বুঝিতে পারে, চেষ্টা করিলেই গায়ের খোলসও খুলিয়া যাইবে। তা'র পরে আমরা যেমন কখনো কখনো জামার ভিতরে দিক্‌টা বাহিরে আনিয়া গা

হইতে জামা খুলিয়া ফেলি, উহারা সেই-রকমে খোলসটাকে উল্‌টাইয়া শরীর হইতে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হয়।

সাপের সমস্ত শরীর তোমরা যদি তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজ কর, তাহা হইলে শরীরের কোনো জায়গাতেই উহাদের কানের চিহ্ন দেখিতে পাইবে না। সাপের কান নাই। কাজেই বলিতে হয়, তাহারা ভালো করিয়া শুনিতে পায় না। শোনার কাজ তাহারা জিভ দিয়াই চালায়। সাপুড়েরা যখন সাপ খেলায়, তখন হয় ত তোমরা সাপের জিভ দেখিয়াছ। আমরা জিভগুলিকে মুখের মধ্যে রাখি, কিন্তু সাপেরা তাহা করে না। ইহারা ক্রমাগত লক্‌-লক্‌ করিয়া জিভ বাহির করিতে থাকে। মুখ বন্ধ রাখিলে আমরা আর জিভ্‌ বাহির করিতে পারি না। কিন্তু সাপেরা মুখ বন্ধ রাখিয়াও জিভ বাহির করে। অধর ও ওষ্ঠকে আমরা যদি চাপিয়া রাখি, তাহা হইলে মুখে একটুও ফাঁক থাকে না। কিন্তু সাপেরা যখন জোরে মুখ বুঁজে তখনো মুখে ফাঁক থাকিয়া যায়। তাহারা এই ফাঁক দিয়াই বারে বারে জিভ বাহির করে।

সাপের জিভ্‌

সাপেরা ঐ-রকমে জিভ বাহির করিয়া কোথায় কি শব্দ হইতেছে বুঝিয়া লয়। আমরা জিভ দিয়া মিষ্টি টক্‌ তিতো ইত্যাদি স্বাদ বুঝিয়া লই, আর সাপেরা জিভ দিয়া শব্দ বুঝিয়া লয়,—ইহা আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় কি ?

সাপেরা যখন তাহাদের লম্বা জিভ বাহির করিবে, তখন লক্ষ্য করিয়ো, দেখিবে জিভগুলি যেন লোহার তারের মতো সরু, আবার তাহার আগাটা যেন দুইভাগে চেরা। লোকে বলে সাপের জিভে বিষ আছে। কিন্তু এ-কথা ঠিক নয়। ইহাদের বিষ জিভে থাকে না। তাই জিভ দিয়া কোন জিনিস ছুঁইলে, তাহাতে বিষ লাগে না।

শব্দ শুনার কাজ ছাড়া সাপেরা জিভ দিয়া আরো একটা কাজ চালায়। তোমরা আগেই শুনিয়াছ, মাগুর, তপ্‌সি প্রভৃতি মাছের মুখে যে শুঁয়ো থাকে, তাহা খুব কাজের জিনিস। কোনো জিনিস কাছে পাইলে আমরা যেমন তাহা হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখি, মাছেরা সেই-রকম শুঁয়ো দিয়া ছুঁইয়া সম্মুখের জিনিসকে পরীক্ষা করে। সাপদের জিভগুলা শুঁয়োর মতো কাজ করে। অন্ধকারে চলার সময়ে ইহারা লম্বা জিভ দিয়া ছুঁইয়া সম্মুখে কোন্ জিনিস আছে জানিয়া লয়। তাহা হইলে দেখ, সাপদের জিভ সামান্য জিনিস নয়। উহা না থাকিলে তাহাদের এক দণ্ডও চলে না।

সাপের মুখ

পর-পৃষ্ঠায় সাপের মুখের একটা ছবি দিলাম। ছবিতে তোমরা উহার চোখ নাক ও মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। মুখখানা কিন্তু দেখিতে একটুও ভালো নয়। কেন জানি না, সাপের চেহারা দেখিলেই যেন ভয় হয়।

আমাদের মুখের উপর ও নীচের চোয়ালের হাড় দুই কানের কাছে ঠেকাঠেকি করিয়া লাগিয়া আছে। তাই আমরা চেষ্টা করিলেই খুব বড় রকমের হাঁ করিতে পারি না। আমরা কোনো গতিকে একটা বড় রসগোল্লা মুখে পুরিতে পারি। কিন্তু খোসা ছাড়াইয়া একটা গোটা কমলা লেবুকে মুখে দিতে গেলে মুস্কিলে পড়িতে হয়। তখন প্রাণপণে চেষ্টা করিলেও হাঁ বড় করিতে পারা যায় না। আমাদের মুখের উপর ও নীচের চোয়ালের হাড় পরস্পর আট্‌কানো থাকে বলিয়াই এত বিপদ্ ঘটে, কিন্তু সাপদের সে বালাই নাই—তাহাদের দুই চোয়ালের হাড় কব্‌জার মতো আট্‌কানো থাকে না। তাই যত বড় ইচ্ছা হাঁ করিয়া উহারা বড় ব্যাঙ্ এবং প্রকাণ্ড মেঠো-ইঁদুর মুখের মধ্যে পুরিতে পারে। হেলে অর্থাৎ হল্‌হলে সাপেরা বড় ব্যাঙ্‌কে ধরিয়া কি-রকমে মুখে পুরে, তোমরা তাহা দেখ নাই কি? তখন মনে হয় বুঝি সাপটার মুখ-খানা চিরিয়া গেল। কিন্তু তাহা হয় না। তাহারা চোয়ালের হাড় দু'খানাকে দূরে সরাইয়া মুখের ফাঁকটাকে প্রকাণ্ড করিয়া তোলে। তাই নিজের শরীরের চেয়ে ছয় সাত গুণ মোটা ব্যাঙ্ বা ইঁদুরকে তাহারা অনায়াসে মুখে পুরিতে পারে। আমাদের চোয়াল যদি সাপের চোয়ালের মতো হইত, তাহা হইলে আমরা এক-

সাপের মুখ

একটা বড় কাঁটাল একেবারে মুখের ভিতরে পুরিতে পারিতাম।

কেবল ইহাই নয়। যাহাতে সাপেরা মোটা শিকার মুখে পুরিতে পারে, তাহার জন্য ইহাদের শরীরে অন্য ব্যবস্থাও আছে। সাধারণ জানোয়ারের মাথায় হাড়গুলি বেশ শক্ত করিয়া পরস্পর জোড়া থাকে। কিন্তু সাপদের মাথার হাড়গুলিকে সম্পূর্ণ ছাড়া-ছাড়া হইয়া থাকিতে দেখা যায়। বড় ইঁদুর বা ব্যাঙ্ গিলিবার সময়ে সাপদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। তাই শিকারের সঙ্গে ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করিতে গিয়া উহাদের মাথার হাড় ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায় না।

তোমাদের খোকাটি যখন একটা বড় জিনিস মুখে পুরিয়া গিলিতে চেষ্টা করে, তখন তাহা গলায় আট্‌কাইয়া যায়। গলায় কোনো জিনিস আট্‌কাইলে নিশ্বাসের পথ বন্ধ হইবার ভয় থাকে। তাই মা তাড়াতাড়ি খোকার মুখে আঙুল দিয়া জিনিসটা বাহির করিয়া দেন। প্রকাণ্ড ইঁদুর গিলিবার সময়ে সাপদেরও নিশ্বাস আট্‌কাইবার ভয় থাকে। কিন্তু উহাদের শরীরে এমন একটি মজার ব্যবস্থা আছে যে, খুব বড় জিনিস গিলিতে গেলেও নিশ্বাস আট্‌কায় না।

আমরা ছেলেবেলায় একটা লোককে দেখিয়াছিলাম, সে মুখ হইতে আধ্ হাত লম্বা জিভ বাহির করিতে পারিত। আমরা তাহার কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতাম।

সে জিভের মধ্যে আবার মস্ত একটা ছেঁদা করিয়া রাখিয়াছিল। চৈত্র মাসে চড়কপূজার সময়ে সে শিবের গাজনের সন্ন্যাসী হইত এবং সেই ছেঁদার ভিতরে মোটা লোহার বাণ চালাইয়া নাচিত। এখন আর চড়কের সময়ে সন্ন্যাসীদের বাণ-ফোঁড়া দেখা যায় না। যাহা হউক সন্ন্যাসীদের মধ্যেই কেবল জিভ্ বাহির করা দেখিয়াছি,—গলার নলিটা শরীরের ভিতর হইতে বাহির করিয়া মুখে আনিতে দেখি নাই। কিন্তু সাপেরা আহার করিবার সময়ে তাহাই করে। খাবারের জিনিস গলায় আট্‌কাইলে পাছে নিশ্বাস বন্ধ হয়, এই ভয় উহাদের অত্যন্ত বেশি। অথচ এক-একটা গোটা ইঁদুর না খাইলেও পেট ভরে না। তাই তাহারা বড় রকমের শিকার মুখে ধরিয়াই গলার নলিটাকে জোর করিয়া মুখে টানিয়া আনে ; তা'র পরে ধীরে ধীরে খাবার গিলিতে আরম্ভ করে। মজার ব্যাপার নয় কি ?

সাধারণ সাপেরা যে দাঁত দিয়া ইঁদুর বা ব্যাঙ্‌কে চাপিয়া ধরে, তাহাও বড় অদ্ভুত। উহাদের মুখের টাক্‌রায় চারি সার এবং নীচের চোয়ালের দুই পাশে দুই সার দাঁত থাকে। তাহা হইলে বলিতে হয়, সাধারণ সাপের মুখে ছয় সার দাঁত আছে। কিন্তু সে দাঁতগুলি আমাদের দাঁতের মতো সোজা নয়। সাপের দাঁত মাছ-ধরার বঁড়শির মতো গলার দিকে বাঁকানো থাকে। তাই শিকার একবার দাঁতে আট্‌কাইয়া গেলে তাহা কোনো ক্রমেই পালাইতে পারে না। বরং মুখের

শিকার যতই ছট্‌ফট্ করিয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করে, দাঁতগুলি ততই জোরে তাহার শরীরে বিঁধিয়া যায়। একবার দাঁতে আট্‌কাইয়া গেলে সাপেরা ইচ্ছা করিলেও মুখের শিকার ছাড়িতে পারে না। তোমরা ইহা দেখ নাই কি? আমরা অনেক দেখিয়াছি। হল্‌হলে সাপে ব্যাঙ্ গিলিতেছে দেখিয়া, আমরা সাপের গায়ে ঢিল ছুঁড়িয়াছি ও নানা রকমে তাহাকে তাড়া দিয়াছি। কিন্তু সাপেরা মুখের শিকার উগ্‌রাইয়া ফেলিতে পারে নাই।

সাপদের চিবাইবার দাঁত নাই। যে দাঁতের কথা বলিলাম, তাহা শিকার ধরিবার জন্যই উহারা ব্যবহার করে। সাপেরা কখনই অন্য প্রাণীদের মতো ঘাস বা লতাপাতা খায় না। ইঁদুর ব্যাঙ্ পাখী এবং অন্য ছোটো পোকা-মাকড়ই উহাদের প্রধান আহারের সামগ্রী।

সাপেরা শীতকে বড় ভয় করে। তাই যে-সব দেশে শীত বেশি, সেখানে প্রায়ই সাপ দেখা যায় না। অগ্রহায়ণ মাসে শীত পড়িতে আরম্ভ করিলেই আমাদের দেশের সাপগুলা গর্ত্তে আশ্রয় লয়। তা'র প'রে শীতের তিন-চারি মাস মড়ার মতো সেখানে পড়িয়া থাকে। এই সময়ে তাহারা কিছুই খায় না; গায়ে খোঁচা দিলেও বেশি নড়াচড়া করে না। ব্যাঙেরা কিছু না খাইয়া কি-রকমে তিন মাস ঘুমায় তাহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। সাপেরা ব্যাঙ্‌দেরই মতো না খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। অনেকে বলে,

সাপেরা কেবল বাতাস খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু এই কথা ঠিক্ নয়। বৎসরে গোটা পাঁচ ছয় ইঁদুর, পাখীর বাচ্চা এবং ব্যাঙ্ না খাইলে তাহাদের চলে না। আমাদের মতো দিনে তিন-চারিবার পেট ভরিয়া খাওয়ার দরকারই হয় না।

সাপের বাচ্চা

সাপদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। স্ত্রী-সাপেরা গর্ত্তে ডিম পাড়ে। কিন্তু পাখীদের মতো ডিমের উপরে বসিয়া তা দেয় না। তোমরা যে-সব বাচ্চা সাপ দেখিতে পাও, তাহারা ডিম হইতেই বাহির হয়। জলে স্থলে সাপেরা বাস করে। কয়েক জাতি খুব বড় সাপকে সমুদ্রেও থাকিতে দেখা যায়। এই-সব সাপের দুই এক জাতি বাচ্ছাও প্রসব করে। আবার অজগর সাপদের নিজের ডিমের চারিদিকে কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকিতেও দেখা যায়।

কয়েক জাতি সাপ আলোকে বড় ভয় করে। তাই রাত্রি না হইলে তাহারা কখনো গর্ত্ত ছাড়ে না। গোক্ষুরা প্রভৃতি বিষাক্ত সাপকে প্রায়ই দিনের বেলায় গর্ত্তের বাহিরে আসিতে দেখা যায় না। রাত্রিতে অন্ধকারে সাপের সম্মুখে যদি আলো ধরা যায়, তাহারা একদৃষ্টিতে আলোর দিকেই চাহিয়া থাকে। তখন তাহারা পালাইবার চেষ্টা করে না। এই-রকমে সম্মুখে আলো রাখিয়া আমরা অনেক গোক্ষুরা সাপ মারিয়াছি।

সাপের শরীরের যন্ত্রাদি

এখানে সাপের শরীরের ভিতরকার যন্ত্রাদির একটা ছবি দিলাম। যে দাগ-কাটা নলটা মুখ হইতে বাহির হইয়া ভিতরে গিয়াছে,—উহাই সাপদের নিশ্বাস টানিবার নল। ইহারি সঙ্গে ফুস্‌ফুসের যোগ আছে। ফুস্‌ফুস্ লম্বা হইয়া সাপটির শরীরের প্রায় মাঝামাঝি পর্য্যন্ত গিয়াছে। নিশ্বাস টানার নলের উপরে যে মোটা নলটি দেখিতেছ, উহাই

সাপের শরীরের যন্ত্রাদি

সাপদের গলার ছিদ্র। এই ছিদ্রের যোগ থাকে উদরের সঙ্গে; আবার উদরের যোগ থাকে নাড়িভুঁড়ি অর্থাৎ অন্ত্রের সঙ্গে। ছবি দেখিলেই বুঝিবে, গলার নলিটাই কখনো মোটা এবং কখনো সরু হইয়া মলদ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছে। মোটা অংশটাই উদর এবং উহার নীচের অংশ অন্ত্র। ছবিতে তিনটি ডিম আঁকা আছে। সাপের ডিম শরীরের ভিতরে

কোন্ জায়গায় থাকে, ছবিটি দেখিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে।

ছবিতে ফুস্‌ফুসের উপরেই সাপের হৃদ্‌পিণ্ড রহিয়াছে। কচ্ছপের হৃদ্‌পিণ্ডের মতো ইহাতে তিনটি মাত্র কুঠারি আছে। সাপের শরীরে কচ্ছপদেরই মতো রক্ত চলাচল করে। তাই ইহাদের শরীর ঠাণ্ডা,—গায়ে হাত দিলে একটুও গরম বোধ হয় না।

সাপের বিভিন্ন জাতি

তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, পৃথিবীতে যত রকম সাপ আছে, তাহাদের প্রায় সবগুলিকেই ভারতবর্ষে দেখা যায়। পৃথিবীতে ৭৮ জাতিতে ২৮৬ উপজাতির সাপ আছে। ইহাদের মধ্যে ২৬৪ উপজাতি আমাদের ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়।

সাপের নাম শুনিলেই আমরা ভয় পাই। কিন্তু এত ভয় পাইবার কারণ নাই। ২৬৪ উপজাতির সাপের মধ্যে অতি অল্প কয়েকটি বিষাক্ত; অন্যগুলির বিষ নাই। তা'ছাড়া বাঘ ও সিংহরা যেমন মানুষের গন্ধ পাইলেই তাহাদিগকে খাইবার চেষ্টা করে, সাপেরা তাহা করে না। ব্যাঙ্, ইঁদুর বা পাখীর ছানাই উহাদের প্রধান খাদ্য,—মানুষ বা অন্য বড় জন্তুর উপরে উহাদের একটুও লোভ নাই। লোভ থাকিলে নালার ছিদ্র দিয়া ঘরে আসিয়া বা ঘাসের মধ্যে লুকাইয়া

থাকিয়া প্রতিদিনই উহারা মানুষ খাইত। সাপেরা মানুষ দেখিলে ভয়ই পায়। তাই যেখানে মানুষের আনাগোনা নাই, এমন জায়গায় তাহারা লুকাইয়া থাকে। কেবল ইঁদুরের লোভে দুই একজাতি সাপ কখনো কখনো আমাদের ঘরে-দুয়ারে আসে। হঠাৎ সাপের সম্মুখে আসিলে বা গায়ে হাত পা ঠেকিলে তাহারা কামড়ায়। তবু সাপ হইতে দূরে থাকা ভালো। বিষাক্ত সাপ অতি ভয়ানক প্রাণী। কোনো গতিকে তাহারা একবার গায়ে দাঁত বসাইলে আর রক্ষা থাকে না।

যাহা হউক সাপদের যে ৭৮ জাতি আছে, তাহাদের সকলের কথা তোমাদিগকে বলিব না! কারণ সবগুলিকে বাংলাদেশে দেখা যায় না। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি থাকে হিমালয় পাহাড়ে, কতক থাকে লঙ্কা দ্বীপে, আবার কতক থাকে মান্দ্রাজ, বেলুচিস্থান ও বর্ম্মায়। যে-সব সাপ আমরা সর্ব্বদা বাংলাদেশে দেখিতে পাই, তাহাদেরি মধ্যে কয়েকটির বিষয় তোমাদিগকে বলিব।

পুঁয়ে সাপ

পুঁয়ে সাপ তোমরা দেখিয়াছ কি? এগুলি চারি পাঁচ ইঞ্চির বেশি লম্বা হয় না। স্যাঁতা ভিজে জায়গা বা পচা কাঠের মধ্যে ইহাদিগকে দেখা যায়। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় এগুলি বুঝি কেঁচো। কিন্তু তাহা নয়, পুঁয়ে সাপ

সাপদেরই একটা জাতি। কেঁচোর গায়ে আংটির মতো দাগ কাটা থাকে, পুঁয়ে সাপের গায়ে তাহা থাকে না। যদি ভালো করিয়া পরীক্ষা কর, তবে উহাদের গায়ে খুব ছোটো-আঁশও লাগানো আছে বুঝিতে পারিবে। কাজেই ইহাদিগকে সাপই বলিতে হয়। কয়েক বৎসর আগে কলিকাতার কলের জলে পুঁয়ে সাপের ভয়ানক উৎপাত হইয়াছিল। ইহারা জলের কলের মধ্যে বাসা করিয়া থাকিত এবং তা'র পর জলের সঙ্গে চৌবাচ্চায় আসিয়া পড়িত।

যাহা হউক পুঁয়ে সাপেরাই সমস্ত সাপের মধ্যে ছোটো। ইহাদের চেয়ে ছোটো সাপ আর খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না।

বরা-চিতি

বড় সাপদের নাম করিতে গেলে বরা-চিতি সাপদের কথা আমাদের মনে পড়িয়া যায়। ইহাদের এক-একটা চৌদ্দ পনেরো হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। সুন্দরবন, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলের জঙ্গলে এ-গুলিকে দেখা যায়। তোমরা ইহা দেখ নাই কি? সাপুড়েরা কখনো কখনো বাঁকে করিয়া আনিয়া বাড়ীতে বাড়ীতে দেখায়।

পর পৃষ্ঠায় একটা বরা-চিতির ছবি দিলাম। ব্যাঙে বা ইঁদুরে ইহাদের পেট ভরে না। তাই খরগোস, শিয়াল, ছাগল এবং ভেড়াগুলিকে ধরিয়া উহারা গিলিয়া ফেলে।

বর্ম্মাদেশের এই জাতেরই এক-রকম সাপকে কুড়ি হাত

পর্য্যন্ত লম্বা হইতে দেখা যায়। ইহারা এক-একটা আস্ত হরিণ, তাহার শিং লোম চামড়া ও হাড় শুদ্ধ গিলিয়া ফেলে। তা'র পরে কুণ্ডলী পাকাইয়া একটা প্রকাণ্ড মাটির ঢিপির মতো পড়িয়া থাকে। যতদিন খাবার হজম না হয় ততদিন ইহারা মোটেই চলা-ফেরা করে না। হেলে ও ঢাড়স্‌ সাপেরা কত তাড়াতাড়ি ছুটিয়া চলে তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। বরা-চিতিরা
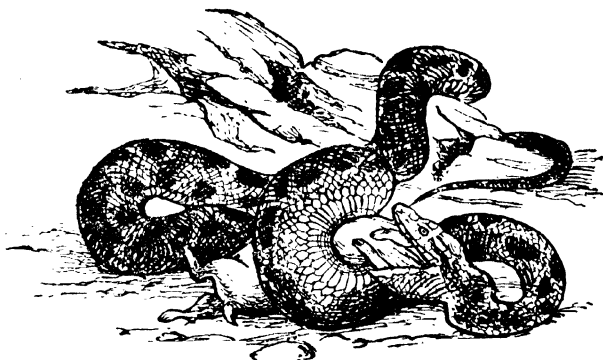
বরা-চিতি

তাহাদের প্রকাণ্ড শরীরটা টানিয়া সে-রকমে চলিতে পারে না। তাই অন্য সাপেরা যেমন খুঁজিয়া পাতিয়া খাবার জোগাড় করে, ইহারা তাহা করে না।

বরা-চিতিরা কি-রকমে জন্তু-জানোয়ার শিকার করে, তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। ইহাদের শিকার ধরিয়া গেলা বড় মজার ব্যাপার।

তোমরা "গোফ-খেজুরে" লোকের গল্পটা শুনিয়াছ কি?

একটা লোক ভয়ানক বোকা ও অলস ছিল। গাছে থোলো-থোলো খেজুর পাকিয়া রহিয়াছে, কিন্তু একটু আলস্য ত্যাগ করিয়া যে সেগুলিকে পাড়িয়া বা কুড়াইয়া লইবে তাহা লোকটার বুদ্ধিতে জোগাইত না। তাই সে গাছতলায় চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিত। সে মনে করিত, যেই গাছের পাকা খেজুর তাহার গোঁফের উপরে পড়িবে, অমনি সে তাহা কপ্ করিয়া মুখে পুরিবে। বরা-চিতিরা "গোঁফ-খেজুরে" লোকদেরই মতো শিকারের আশায় কুণ্ডলি পাকাইয়া এক গাদা মাটির মতো পথে বা জলের ধারে পড়িয়া থাকে। তা'র পরে ভাগ্যক্রমে যদি একটা শিয়াল বা একটা খরগোস সেখান দিয়া চলিয়া যায়, তবে চট্ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে এবং তাহার শরীরের চারিদিকে পাকে-পাকে লেজ জড়াইতে আরম্ভ করে। বরা-চিতিদের লেজের বাঁধন খসাইয়া কোনো জন্তুই পালাইতে পারে না! বড় বড় হরিণেরাও এই বাঁধনে পড়িয়া মারা যায়; বোধ করি, তাহাদের হাড়গোড়ও গুঁড়া হইয়া যায়। তা'র পরে সাপেরা সেই প্রকাণ্ড হাঁ মেলিয়া শিকারের মুণ্ডটা ধরিয়া সমস্ত শরীর গিলিয়া ফেলে।

তোমরা যদি কখনো কলিকাতার আলিপুরের চিড়িয়া-খানা দেখিতে যাও, তবে সাপের ঘর দেখিয়া আসিয়ো। সেখানে নানাজাতি সাপের চেহারা দেখিতে পাইবে। বরা-চিতিদের রাখা হয়, তারের জাল দিয়া ঘেরা পুকুরের ধারে। ইহারা স্যাঁতা জায়গাই পছন্দ করে,—আবার খুব গরমের

দিনে পুকুরের জলে গা ডুবাইয়া পড়িয়া থাকে। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, রোজ তাহাদিগকে একটা করিয়া ছাগল খাইতে দেওয়া হয়। কিন্তু তাহা নয়,—সপ্তাহে একটা করিয়া পাতিহাঁস বা মুরগী খাইতে দিলেই তাহারা খুসী থাকে। তা'র পরে শীতের দুই মাস তাহারা কিছুই না খাইয়া মড়ার মতো পড়িয়া থাকে। তাহা হইলে দেখ, সাপেরা কত অল্প খায়। কিন্তু এত অল্প খাইয়াও তাহারা মরে না। এই সাপ দেড় বৎসর কিছু না খাইয়া মরে নাই, ইহাও দেখা গিয়াছে।

তোমরা দুই-মুখো সাপ দেখিয়াছ কি? ইহাদের সাম্‌নে একটা এবং পিছনে আর একটা মুখ থাকে। সাপুড়েরা কখনো কখনো এই সাপ ঝাঁপিতে ভরিয়া লোকের বাড়ী-বাড়ী দেখাইয়া বেড়ায়। এগুলিও বরা-চিতি জাতির সাপ। লম্বায় ইহারা দুই হাতের বেশি হয় না। কিন্তু লেজের মুখটা সত্যকার মুখ নয়। এই সাপদের লেজগুলি স্বভাবতঃই ভোঁতা। সাপুড়েরা সেই ভোঁতা লেজে কখনো কখনো দুইটা কাচের চোখ্ বসাইয়া দেয়। লোকে লেজের উপরে এই চোখ দেখিয়া ভোঁতা লেজকে মনে করে মুখ।

গোক্ষুরা জাতি

বরা-চিতি সাপের বিষ নাই। এখন তোমাদিগকে বিষধর সাপদের কথা বলিব।

তোমরা হয় ত সকলেই গোক্ষুরা সাপ দেখিয়াছ। সাপুড়েরা যখন সাপ খেলাইতে আসে তখন তাহাদের ঝাঁপির ভিতরে এ-রকমে দুই চারিটা সাপ প্রায়ই থাকে। ইহাদের দাঁতে ভয়ানক বিষ আছে। একবার কাম্‌ড়াইলে আর রক্ষা থাকে না।

আমাদের বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গাতেই গোক্ষুরা সাপ দেখা যায়। সুন্দরবন এই সাপদের একটা প্রধান আড্ডা। কালো গোক্ষুরা সাপকে কেউটে সাপ বলে। ইহাদের গলার নীচের কয়েকটা আঁশ হল্‌দে রঙের দেখা যায়। কেউটেরা ভয়ানক রাগী সাপ; কাছে জন্তু-জানোয়ার গেলে তাহাদের তাড়া করে। কেউটেরা ভিজে স্যাঁতা জায়গায় থাকিতে পছন্দ করে। তাই ধানের ক্ষেতে ইহাদিগকে প্রায়ই থাকিতে দেখা যায়। সাধারণ গোক্ষুরা সাপেরা কেউটেদের মতো রাগী নয়। তাড়া না দিলে বা অনিষ্ট করিতে না গেলে, উহারা ফণা তুলিয়া ধরে না। শুক্‌নো উঁচু জায়গা গোক্ষুরেরা পছন্দ করে। তাই উইয়ের ঢিপির মধ্যে বা গৃহস্থদের ঘরের মেজেতে ইঁদুরের গর্ত্তে ইহাদিগকে প্রায়ই দেখা যায়।

গোক্ষুরা সাপ যখন ফণা তুলিয়া ও ফোঁস্‌-ফোঁস্‌ শব্দ করিয়া ছোবল মারিতে যায় তখন তাহার ফণাটি লক্ষ্য করিয়ো; দেখিবে, ফণার পিঠে চশমার মতো দুইটি চোখ আঁকা আছে। লোকে এই দাগকে বলে শ্রীকৃষ্ণের পায়ের চিহ্ন।

কিন্তু সকল গোক্ষুরা সাপেরাই ফণায় যে এ-রকম চিহ্ন থাকে, তাহা নয়। কোনো জাতির ফণায় চোখের মতো একটিমাত্র দাগ আছে, ইহাও আমরা দেখিয়াছি। আবার যাহাদের ফণায় ঐ-রকম দাগ একেবারেই নাই, ইহাও দেখা গিয়াছে।

গোক্ষুরা সাপেরা কি-রকমে ফণা ধরে তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। ইহাদের মাথা হইতে লেজের শেষ পর্য্যন্ত মেরুদণ্ড আছে এবং তাহার প্রত্যেক হাড়ের সঙ্গে মাছের কাঁটার মতো কাঁটা লাগানো থাকে। ইহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। গোক্ষুরা সাপেরা ফণা ধরিবার সময়ে মাথার কাছেই এই কাঁটাগুলিকে খাড়া করিয়া মুখের নীচের অংশটাকে চওড়া করিয়া ফেলে।

তোমরা হয় ত ভাবো, গোক্ষুরা সাপের মুখে যতগুলি দাঁত আছে তাহার সবগুলিতে বিষ মাখানো থাকে। কিন্তু তাহা নয়,—উহাদের মুখের উপরকার চোয়ালে দুইটা করিয়া পৃথক্ বিষ-দাঁত থাকে।

এখানে গোক্ষুরা সাপের মুখের একটা ছবি দিলাম। মুখের কোন্ জায়গায় বিষ-দাঁত দুইটি থাকে, ছবি দেখিলেই তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে। ছবিতে দাঁতের গোঁড়ায় পেঁয়াজের মতো দুইটি মাংসপিণ্ড দেখা যাইতেছে। উহাই বিষের থলি অর্থাৎ বিষ-

বিষ-দাঁত

কোষ। কুকুর, শেয়াল এবং আমাদের দাঁত যেমন মাড়ীর উপরে শক্ত করিয়া আঁটা থাকে, সাপদের বিষ-দাঁত সে-রকমে শক্ত করিয়া আঁটা থাকে না এবং তাহা মাড়ীর উপরে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াও থাকে না। যখন কাম্‌ড়াইবার দরকার না থাকে, তখন সে-দুইটি টাক্‌রায় হেলিয়া পড়িয়া থাকে। দরকার হইলেই সাপেরা তাহাদিগকে খাড়া করিতে পারে। কেবল ইহাই নয়,—ঐ দাঁত দুইটির গায়ে আবার সরু নালা কাটা থাকে। কাম্‌ড়াইবার সময়ে দাঁত খাড়া হইলেই সেই বিষ-কোষ হইতে বিষ বাহির হইয়া ঐ নালা দিয়া তাহা দাঁতের আগায় গিয়া হাজির হয়। এই জন্যই বিষ-দাঁত দিয়া কাম্‌ড়াইলেই সাপদের বিষ রক্তে মিশিয়া যায়।

কেবল যে গোক্ষুরা সাপেরই এই-রকম বিষ-দাঁত আছে, তাহা নয়। রাজ-সাপ, করেতা, শঙ্খচূড় প্রভৃতি যে-সব বিষওয়ালা সাপ আছে, তাহাদের দাঁতগুলিও গোক্ষুরা সাপের মতো।

সাপুড়েরা বড় বড় গোক্ষুরা সাপ গলায় ঝুলাইয়া তুব্‌ড়ী বাজাইয়া নাচ-গান করে। অথচ সাপগুলা তাহাদিগকে কাম্‌ড়ায় না। আমরা ইহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাই; মনে করি, সাপুড়েরা বুঝি মন্ত্র পড়িয়া সাপগুলাকে বশে আনে। কিন্তু তাহা নয়। মুখের কোন্ জায়গায় সাপদের বিষ-দাঁত আছে, তাহা সাপুড়েরা আমাদের চেয়ে ভালো জানে। নূতন সাপ ধরিবামাত্র,

তাহারা উহার বিষ-দাঁত দুইটি ভাঙ্গিয়া দেয়। কাজেই বিষ-দাঁত ভাঙ্গা সাপেরা হঠাৎ কামড়াইলেও তাহাদের কোনো অনিষ্ট হয় না।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, একবার বিষদাঁত ভাঙিয়া দিলে সাপেরা চিরকালের মতো বিষ-হীন হয়। কিন্তু তাহা হয় না। বিষ-দাঁত ভাঙিয়া গেলে সেখানে আপনা হইতেই আবার নূতন বিষ-দাঁত গজাইয়া উঠে। দাঁতে অঙ্কুর প্রথম হইতেই সাপদের মুখে থাকে।

গোক্ষুরা সাপ দিনের বেলায় হঠাৎ গর্ত্তের বাহিরে আসিতে চায় না। কিন্তু তাহাদের বাচ্চারা সে-রকম নয়। তাহারা রাত-দিন মানে না। ডিম হইতে বাহির হইয়াই চারিদিকে ছুটাছুটি জুড়িয়া দেয়। আমরা দিনের বেলাতে অনেক গোক্ষুরার বাচ্চা মারিয়াছি এবং ধরিয়াছি। ধাড়ী সাপদের মতো ইহারাও ফণা তোলে এবং ফোঁস্-ফোঁস্ শব্দ করে। কিন্তু বিষ-ওয়ালা সাপদের মধ্যে গোক্ষুরা সাপই সাপুড়েদের হাতে পড়িলে সহজে বশে থাকে। কেউটে সাপকে কিন্তু বশে রাখা দায়। তাই সাপুড়েরা কেউটে সাপদের খেলাইতে পারে না।

শঙ্খচূড় সাপের কথা বোধ হয় তোমরা শুন নাই। ইহারা গোক্ষুরা জাতিরই সাপ। ইহাদের এক-একটা কখনো কখনো দশ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। যখন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায় তখন দেখিলে ভয় হয়। বাংলাদেশে শঙ্খচূড় সাপ কিন্তু

প্রায়ই দেখা যায় না। বর্ম্মার জঙ্গলে ইহারা বাস করে, গ্রামের বা নগরের কাছে আসে না। আসিলে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার হইত, একবার ভাবিয়া দেখ। কাছে ছোটো জন্তু-জানোয়ার দেখিলেই শঙ্খচূড়েরা তাহাদিগকেই কাম্‌ড়াইতে যায়। অন্য সাপদেরও ইহারা যম,—ছোটো বা বড় সাপ কাছে পাইলেই ইহারা সেগুলিকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলে। সাপুড়েদের কাছে আমরা দুই-একবার শঙ্খচূড় সাপ দেখিয়াছি।

করেতা, চন্দ্রবোরা, রাজ-সাপ—ইহারাও গোক্ষুরাদের জাতি-ভাই। ইহাদের সকলেরই বিষ-দাঁত আছে। কিন্তু বাংলাদেশে এগুলিকে সর্ব্বদা দেখা যায় না। করেতা সাপ সাঁওতাল পরগণায় ও বিহার অঞ্চলে দেখা যায়। এগুলি দুই হাত বা আড়াই হাতের বেশি লম্বা হয় না। কিন্তু ইহারা অতি ভয়ানক সাপ। প্রতি-বৎসরে অনেক লোক করেতা সাপের কামড়ে মারা যায়।

চন্দ্রবোরা সাপ দেখিতে অতি বিশ্রী। মানুষ বা অন্য জন্তু কাছে গেলে ইহারা ভয় পাইয়া পালায় না এবং সহজে নড়াচড়া করিতেও চায় না। চন্দ্রবোরার বিষদাঁত গোক্ষুরার বিষদাঁতের চেয়ে লম্বা হয়।

এই তো গেল ডাঙার বিষওয়ালা সাপদের কথা আমাদের ভারতবর্ষের সমুদ্রের জলেও অনেক বিষাক্ত সাপ দেখা যায়। এই-সব জলের সাপের নাকের ছিদ্র কতকটা মাথার উপরে থাকে। তাই সব শরীর জলে ডুবাইয়া কেবল মাথা উপরে

রাখিয়া ইহারা নিশ্বাস টানে। আমাদের পুকুরের ঢোঁড়া সাপেরা যেমন জল ছাড়িয়া ডাঙাতে উঠে, সমুদ্রের সাপেরা তাহা করে না। এই-সব সাপের লেজ প্রায়ই মাছের লেজের মতো পাশাপাশি চেপ্‌টা। এই-রকম লেজ নাড়িয়া তাহারা অনায়াসে জলে সাঁতার কাটিয়া চলে।

ঢাঁড়স্‌ জাতি

এই জাতির সাপদের মধ্যে আমরা ঢাঁড়সকেই সকলে জানি। তাই ইহার নাম ঢাঁড়স্‌ জাতি দিলাম। ঢাঁড়স্‌ তোমরা দেখ নাই কি? ইহাকে কোনো কোনো জায়গায় লোকে ঢ্যাম্‌না সাপও বলে। ইহারা কখনো কখনো পাঁচ ছয় হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। দিনের বেলাতেই ইহাদিগকে মাঠে-ঘাটে ইঁদুর-ব্যাঙ্ খোঁজ করিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। মানুষ দেখিলে ইহারা ভয় পায়। দেখিতে গোক্ষুরা সাপের মতো হইলেও ঢাঁড়স্‌ সাপের বিষ নাই এবং গোক্ষুরার মতো ফণাও নাই। ইহাদের দাঁতগুলি একবারে নিরেট্। লোকে বলে, ইহারা নাকি গৃহস্থের গোয়ালে গিয়া গরুর বাঁট চুষিয়া দুধ খায়। কিন্তু একথা ঠিক্ নয়। ইঁদুর বা ব্যাঙ্ খাইবার জন্য ইহারা কখনো কখনো হয় ত গোয়ালে যায়।

লাউডগার জাতি

এই জাতির সাপদের মধ্যে আমরা লাউড়গাদের প্রায়ই দেখিতে পাই। ইহাদের মুখের দুই একটা দাঁতে গোক্ষুরার

বিষ-দাঁতের মতো খাঁজ-কাটা থাকে। তাহা দেখিয়া বোধ হয়, ইহাদের দাঁতে একটু আধটু বিষ আছে। কিন্তু সে বিষ মানুষ বা অন্য বড় জন্তুর অনিষ্ট করিতে পারে না।

লাউডগা সাপের গায়ের রঙ্ সবুজ এবং শরীরটা লম্বা ও সরু; ঠিক যেন লাউ গাছের তাজা ডগার মতো। তাই ইহাদিগকে লাউডগা সাপ বলে। লাউডগারা গর্ত্তের মধ্যে থাকে না; গাছে-গাছে বেড়াইয়া টিক্‌টিকি, গিরগিটি, মাক্‌ড়সা ও অন্য ছোটো পোকা-মাকড় খাইয়া বেড়ায়। বেত-আছড়া সাপেরাও এই জাতির অন্তর্গত। ইহারাও খাবারের সন্ধানে গাছে-গাছে বেড়ায় এবং তাড়া পাইলে লাফাইয়া দূরে যায়।

তাহা হইলে দেখ, জল স্থল এবং গাছের আগাও নিরাপদ্ নয়। সব জায়গাতেই সাপ থাকিতে পারে।

ঝুম্ঝুমি সাপ

পর-পৃষ্ঠায় এক-রকম সাপের ছবি দিলাম। ইহাদের ইংরেজি নাম র‍্যাটেল্ (Rattle) সাপ। বাংলায় ইহাদিগকে ঝুম্ঝুমি সাপ নাম দিলাম।

এই সাপ ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ইহাদের অনেক জাতিকে এখানে দেখা যায়। ঝুম্ঝুমি সাপের আসল বাসস্থান আমেরিকা।

ছবিতে দেখ, সাপটার লেজে ঝুম্‌ঝুমির মতো একটা অংশ জোড়া আছে। আমাদের খেলার ঝুম্‌ঝুমি যেমন কোনো কাঠ বা ধাতু দিয়া তৈয়ারি এ-গুলি কিন্তু সে-রকমে তৈয়ারি নয়। গরুর বা মহিষের শিঙ্‌ তোমরা দেখিয়াছ কি? এই সাপদের লেজের ঝুম্‌ঝুমি ঠিক্‌ তাহারি মতো জিনিসে তৈয়ারি। ঝুম্‌ঝুমিগুলির আকৃতি বড় মজার। কতকগুলি গোটা-

ঝুম্‌ঝুমি সাপ

গোটা ঘণ্টাকে উপরে-উপরে সাজাইয়া রাখিলে যে-রকমটি হয়, ঝুম্‌ঝুমির আকৃতি দেখিতে কতকটা সেই-রকমের। খোলস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝুম্‌ঝুমিতে এক-একটা নূতন থাক্‌ যোগ হয়। তাই কতকগুলি থাক্‌ আছে, তাহা গুণিয়া সাপদের বয়স ঠিক্‌ করার চেষ্টা হয়। কিন্তু এই হিসাবে বয়স ঠিক্‌ করিতে গেলে প্রায়ই ভুল হইয়া পড়ে। সাপদের গায়ের খোলস যেমন খসিয়া পড়ে, ঝুম্‌ঝুমির দুই-একটা থাক্‌

সেই-সময়ে মাঝে মাঝে ঝরিয়া যায়। কাজেই, ঝুম্‌ঝুমিতে কতগুলি থাক্‌ আছে, তাহা গুণিয়া বয়স ঠিক করা যায় না।

আমাদের গোক্ষুরা বা কেউটে সাপের মতো ঝুম্‌ঝুমি সাপেরও মুখে বিষ-দাঁত আছে। তাই মানুষ বা অন্য জন্তুকে একবার কাম্‌ড়াইলে তাহার আর রক্ষা থাকে না। কিন্তু এই সাপদের লেজের ঝুম্‌ঝুমি জন্তু-জানোয়ারদের সাবধান করিয়া দেয়। আদর করিলে তোমাদের পোষা কুকুর যেমন ঘন ঘন লেজ নাড়ে, কাছে শিকার পাইলে ঝুম্‌ঝুমি সাপেরা তাহাদের লেজগুলিকে সেই-রকমে নাড়িতে থাকে ;—ইহাতে ঝুম্‌ঝুমিগুলি বাজিয়া উঠে। এই শব্দ শুনিয়া গরু, ছাগল, ভেড়া মানুষ সকলেই ছুটিয়া পালাইয়া যায়। লেজের শেষে ঝুম্‌ঝুমি না থাকিলে এই সাপের কামড়ে যে কত মানুষ এবং কত জন্তু মারা যাইত, তাহার হিসাবই হয় না।

অদ্ভুত সাপ

আমরা আগেই তোমাদিগকে বলিয়াছি সাপেরা ডিম প্রসব করে এবং সেই-সব ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হয়। পরপৃষ্ঠায় যে এক-রকম সাপের ছবি দিলাম, তাহারা বড় অদ্ভুত প্রাণী। ইঁদুর, বিড়াল, ছাগল প্রভৃতি জন্তুদের মতো ইহারা জ্যান্ত বাচ্চা প্রসব করে। আমেরিকার সমুদ্রের ধারে যে-সব স্যাঁতা জায়গা আছে, এই সাপেরা সেখানে বাস করে। ইহাদের দাঁতে ভয়ানক বিষ আছে।

দেখ, ছবিতে ধাড়ী সাপের কাছে তাহাদের বাচ্চাও রহিয়াছে।
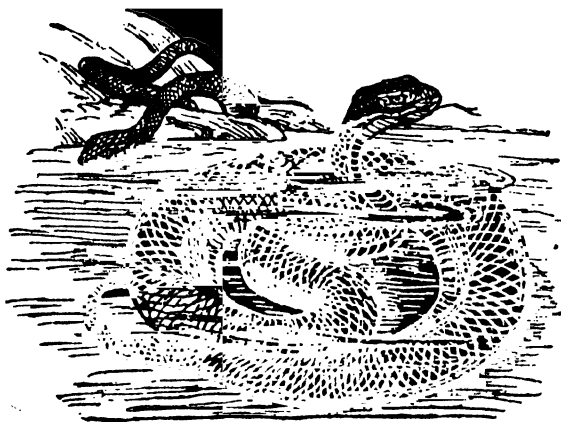
অদ্ভুত সাপ

সাপের বিষ

সাপের বিষ অতীব ভয়ানক জিনিস। কোনো প্রকারে ইহা রক্তের সঙ্গে মিশিলে ছোটো-বড় সকল জানোয়ারই মারা যায়। কিন্তু রক্তের সঙ্গে না মিশাইয়া যদি বিষ গায়ে লাগানো যায়, তাহাতে কোনো অনিষ্ট হয় না। তাই অনেকে বলে খানিকটা সাপের বিষ যদি কোনো প্রাণীকে খাওয়ানো যায়, তবে সে মরে না। কিন্তু মুখে যদি কোনো-রকম ঘা থাকে এবং বিষ খাইবার সময়ে যদি তাহা ঘায়ের রক্তে লাগে, তবে সর্ব্বনাশ হয়।

তোমরা সাপের বিষ বোধ করি দেখ নাই। সাপুড়েরা

সাপ ধরিয়া তাহার দাঁত হইতে বিষ বাহির করিতেছে, ইহা আমরা একবার দেখিয়াছি। কেউটে বা গোক্ষুরা সাপের গলা চাপিয়া ধরিয়া তাহারা উহাদের দাঁতের আগায় একখানি ঝিনুক ধরিয়া রাখে ;—এই ঝিনুকে সরিষার তেলের মতো কয়েক ফোঁটা বিষ জমা হয়। সাপের বিষ দিয়া আমাদের দেশের কবিরাজরা নাকি ওষুধ তৈয়ারি করেন।

বসন্তের টিকা লইলে বসন্ত হয় না। ধনুষ্টঙ্কারের টিকা দিলে ধনুষ্টঙ্কারের রোগী আরাম হইয়া যায়। এই-রকম, ডাক্তারেরা প্লেগ্, কলেরা প্রভৃতির রোগেরও টিকা দিয়া থাকেন। সাপে কাম্‌ড়াইলে যাহাতে মানুষ না মরে তাহার জন্য টিকা দিবার চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু আজও এই চেষ্টায় বিশেষ ফল পাওয়া যায় নাই।

সাপে কাম্‌ড়াইলে কামড়ের জায়গাটার কাছে খুব আঁটিয়া বাঁধন দেওয়া প্রয়োজন। বাঁধন এ-রকম জায়গায় দেওয়া দরকার যেন রক্তের সহিত মিশিয়া বিষ হৃদ্‌যন্ত্রে গিয়া না পৌঁছায়। বাঁধন দিয়াই ডাক্তার ডাকা উচিত। ডাক্তার আসিয়া কামড়ের জায়গার চারিদিকে কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিলে এবং ঘায়ের জায়গায় ওষুধ (Permanganet Solution) লাগাইলে রোগী প্রায়ই আরাম হয়।

কোনো কোনো সাপের রোজা কামড়ের জায়গায় মুখ লাগাইয়া বিষ শুদ্ধ রক্ত চুষিয়া লয়। ইহাতে হয় ত রোগী আরাম হয়,

কিন্তু রোজার বিপদ ঘটে। রোজার গায়ের রক্তে রোগীর রক্ত একটু মিশিলেই রোজা মারা যায়।

তোমরা বিষ-পাথর দেখিয়াছ কি? ইহা সাপুড়ে ও বেদেদের কাছে থাকে। লোকে বলে, শরীরের যে-জায়গায় সাপে কামড়ায়, সেখানে ঐ পাথরের টুক্‌রাটি বসাইয়া দিলে তাহা রক্তের বিষ টানিয়া বাহির করে। আমরা বিষ-পাথর দেখিয়াছি, কিন্তু উহা রক্ত হইতে বিষ টানিয়া লয় কি না, তাহা দেখি নাই।